মেম বউ

ডাঃ নীলরতন হাটুয়া

জাগরী প্রকাশনী
কলকাতা ৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

প্রকাশিকা : শ্রীমতী মিনতি খাঁ
৯৯/১ জে বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৪

ডাঃ নীলরতন হাটুয়া
৫০/২ প্রসন্নকুমার দত্ত লেন
শিবপুর, হাওড়া-২

মুদ্রক : গীতা প্রিন্টার্স
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রণেন মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

জাগরী : ৭৪/৫ এ, বাগবাজার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৩

জ্ঞানতীর্থ : ২০ কেশব সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

পুস্তক বিপণি : ২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত সহধর্মিণী
শ্রীমতী সত্যভামা হাটুয়ার
স্মরণে

কোন গল্প কোথায় আছে

মেম বউ

উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল। ডাক্তারী পাশ করে হাউস সার্জনের তকমা নিয়ে চললো শিক্ষানবিশি। ছুরি কাঁচি নিয়ে মানুষের আস্ত শরীরটাকে কেটে রক্তপাত করো, আবার রক্ত বন্ধ করো। কাটা জায়গাটা সেলাই করে আবার জোড়া লাগাও। কাটা ছেঁড়া করতে করতে হাতখানা বেশ পাকিয়ে ফেললো ইন্দ্রনীল।

সার্জারীর অধ্যাপক ডাঃ অমল পালের প্রিয়পাত্র হতে ইন্দ্রনীলের বেশী দিন সময় লাগলো না।

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর্নেস্ট বিভান বিলেতে ন্যাশনাল হেলথ স্কীম চালু করলেন। কালো চামড়ার ডাক্তারদের দিয়ে ভরে তোলা হতে লাগলো হাসপাতালগুলো। এই সুবাদে বিলেতে একবার গিয়ে পড়লেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি। বছর খানেক বাদেই একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী, বছর তিনেক পরে একখানা নতুন গাড়ী আর চিত্তবিনোদনের জন্য নতুন নতুন গ্যাজেট বাড়িতে আসতে শুরু করবে।

এই সময়টাকে বিলেত যাওয়ার একটা স্বর্ণযুগ বলা যায়। পাশপোর্ট করাও খুবই সহজ ব্যাপার ছিলো। পুলিশ ভেরিফিকেশনের ও-কে সার্টিফিকেট পাওয়ার কোন ঝামেলা ছিলনা। তার কারণ সেই সময়টাতে পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন শুরু হয়নি। কংগ্রেসের তখন রমরমা রাজত্ব। নেহরু সাহেব তখন পরাধীনতার নাগপাশে জরাজীর্ণ ভারতবর্ষ নামক ছ্যাকরা গাড়ীটাতে তাপ্পি মেরে মোটামুটি একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। রাজনীতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলনা বললেই চলে। অতএব এই একটা স্থিতিশীল অবস্থায় দেশের সকলেই একটা লাইনে চলছে। বিশেষ করে কোন ডাক্তারের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় কোন অভিযোগের উল্লেখ না থাকার কথা। ওদেশে গিয়ে চাকরির জন্য জব ভাউচার পাওয়াও ছিল সহজ।

বিলেতে গিয়ে ফুল রেজিস্ট্রেশন পেতে কোন অসুবিধে ছিলনা, কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি. এস ডিগ্রি ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিল প্রশংসিত এবং অনুমোদিত। এই জিনিষটার বারোটা বাজলো উনিশশো সাতষট্টির পর থেকে। খবরের কাগজে এবং ওদেশের টি. ভি-তে আমাদের এখানকার

গণ-টোকাটুকির ছবি দেখে বৃটিশ সিংহ হালুম করে এক লাফে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমাদের ডিগ্রি রেকগনিশনের সনদের উপর। তারপর তীক্ষ্ন দাঁতে কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলল কাগজটা। এই না দেখে আমাদের ভারতমাতাও চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমিও তোমাদের এফ. আর. সি. এস. ও এম. আর. সি. পি মানি না। ওগুলো সব ডিপ্লোমা। আমাদের দেশের এম. এস বা এম. ডি-ই হচ্ছে ডিগ্রি।'

ইন্দ্রনীলের হাউস স্টাফ করা শেষ। ইতিমধ্যেই জব ভাউচার, পাশপোর্ট ইত্যাদিও প্রস্তুত। মহম্মদ আলির দোকানে স্যুটের কাপড় কেনা, আসলামের দোকানে স্যুট তৈরী করা এবং শীলা থেকে খানতিনেক টাই কেনা সমাপ্ত। পাঁজি দেখে দিনস্থির করলেন বড়দা।

কোচিন থেকে প্যাসেঞ্জার জাহাজ ছাড়বে। অতএব মাদ্রাজ মেলে প্রথম শ্রেণীর রিজারভেশন বড়দা পাকা করে ফেলেছেন। নির্দিষ্ট দিনে বড়দাকে চোখের জলে ভাসিয়ে মাদ্রাজ মেল হুস্ হুস্ করে ইন্দ্রনীলকে নিয়ে হাওড়া স্টেশন ত্যাগ করলো।

ইন্দ্রনীলের ধ্যান জ্ঞান হলো এফ. আর. সি. এস. নামক বস্তুটিকে যেন তেন প্রকারেণ করায়ত্ত করা। পক্ষকালের জাহাজ পথে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজিটা পুরোপুরি ঝালিয়ে নিলো।

লন্ডনে পৌঁছে প্রথমে উঠলো ইন্ডিয়া হাউসে। ফরেন এক্সচেঞ্জ যা ছিলো তাতে মোটামুটি সাতদিন চলবে। রোজ সকালে উঠে বি. এম. জে দেখে এপ্লিকেশন করা চললো। সাতদিন কেটে গেল এখনও কোন হদিস নেই চাকরির। ইন্ডিয়া হাউসেই জামসেদপুরের একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার ছেলের পরামর্শে আনএমপ্লয়মেন্ট ভাতার জন্যে দরখাস্ত করলো ইন্দ্রনীল। দুসপ্তাহের জন্যে মঞ্জুর হলো বেকার ভাতা। মোটামুটি দুবেলা খাবার খরচা চলে যেতে লাগলো। হঠাৎ আঠারো দিন ইংল্যান্ড বাসের পর ইন্দ্রনীল পেয়ে গেলো একটা ইন্টারভিউ কল। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি হসপিটালে ছ' সপ্তাহের লোকাম হাউস অফিসারশিপে নির্বাচিত হলো।

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ওর বস্। বেশ কড়া লোক কিন্তু ইন্দ্রনীলকে হাতে ধরে কাজ শেখাতে কসুর করেন নি। সদ্য বিলেতে এসে খুবই হোম সিক্ লাগছে। এক একবার ওর বড়দার কাছে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে কেম নদীর ধারে বেড়াতে যেতো। ইউনিভার্সিটির ছেলেদের বাইচ খেলা দেখতো আপন মনে। কেম নদীতে যখন সাদা ঝকঝকে স্পীড বোটগুলোকে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখতো, তখন ওগুলোর মধ্যে ইন্দ্রনীল যেন দেখতে পেতো কলকাতার গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরার ছোট ছোট নৌকোগুলোকে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে ইন্দ্রনীল কেম নদীর ধারে একটা বিরাট পীচ গাছের তলাতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে নিজেকে আপন করে পেতো।

সেদিনটা বোধ হয় শনিবার হবে। সন্ধ্যে হয় হয়। বাইচ খেলার নৌকো সব ক্লাবশেডে চলে গিয়েছে। নদীর ধারে বিশ্রামরত কপোত কপোতীদের ভীড় বেশ হাল্কা হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ পেছনে থেকে কে যেন সম্বোধন করলো—'হ্যালো!'

ইন্দ্রনীল পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো এক বিড়ালাক্ষী বিদেশিনী মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে। ইন্দ্রনীল নিজে একবার 'হ্যালো' বলে প্রতি সম্ভাষণ জানালো।

মেয়েটির পরনে অনাড়ম্বর বেশভূষা, ছোটখাট পাতলা চেহারা। মুখের বাঁদিকে ও দুহাতে মেছেতার দাগ বেশ স্পষ্ট। চুল ছোট করে ছাঁটা নয়। দেখে অন্ততঃ সুন্দরী এবং আধুনিকা আখ্যা দেওয়া যাবেনা। মেয়েটি নিজেই তার পরিচয় দিলো, 'আমার নাম মেরী গলব্রেথ। আমি একজন বৃটিশ সিটিজেন। আমার বাবা মিঃ উইলিয়াম গলব্রেথ কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান। আমি ইণ্ডোলজি স্পেশাল পেপার নিয়ে বি. এ ক্লাশের ছাত্রী।'

'শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম'—ইন্দ্রনীল এই দ্বিতীয়বারের জন্যে মুখ খুললো।

'আমি ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে খুব ইন্টারেস্টেড। আপনি নিশ্চয় ভারতীয়। চিনতে আমি মনে হয় ভুল করিনি ?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন—আমি ভারতীয় এবং বাঙ্গালী।'

'নেক্স্ট উইক এন্ডে আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে বলুন ? ইণ্ডিয়ার কালচার, ওখানকার মানুষের সুখ, দুঃখ, ভালবাসার ছোঁয়া আমি পেতে চাই। রিয়েল একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে না মিশলে আমার ইণ্ডোলজী সাবজেক্ট পড়া একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

'আপনি বলুন, আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করবো ?'—খুব আমতা আমতা করে ইন্দ্রনীল বললো।

মেরী কোন সংকোচ না করে বলে ফেললো, 'কেন আপনি আসছে শনিবার সন্ধ্যেবেলা আমাদের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে চলে আসুন। আমার মা মারা গেছেন। বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। মাই ফাদার ইজ এ ফাইন ম্যান।'

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গেটের দিকে এগিয়ে চললো। অবশেষে পরস্পর 'বাই' বলে বিদায় নিলো।

হসপিটাল কোয়ার্টারে ফিরে ইন্দ্রনীল কেবলই ওই ইংরেজ ললনার কথা ভাবতে লাগলো। শনিবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ মেরীদের বাড়ির কলিংবেলটা বেজে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুললেন বাহান্ন তিপান্ন বছরের এক ভদ্রলোক। পরিচয় দিলেন উনি মিঃ উইলিয়াম গলব্রেথ। ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললেন ইন্দ্রনীলকে। ড্রইংরুমটা ভিক্টোরিয়ান যুগের নানান উদ্ভট সামগ্রী দিয়ে সাজানো। সোফায় দুজনে আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ গলব্রেথ শুরু করলেন, 'ইউ মাস্ট বি মেরীজ ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড। মেরী তোমার কথা আমাকে বলেছে। আমি ইন্ডিয়াকে খুব ভালবাসি। আমি মিঃ নেহরুর স্কুল হ্যারোতে পড়তাম। ওখানকার পুরো স্কুলটাতে ওঁনার স্মৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তোমাদের দেশকে এতদিন আমাদের অধীনে রাখা খুবই অন্যায় হয়েছে।'

মেরী ট্রেতে করে কফি নিয়ে হাজির। কফি খেতে খেতে ভারতের কত কি জিনিষের আলোচনা চলতে লাগলো। তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা এমনকি টেরাকোটার তৈরী বাঁকুড়ার ঘোড়া টগবগ করে ওদের আলোচনার আসরে এসে হাজির হলো।

ছ'মাসের লোকাম জব শেষ। এবারে রয়াল লন্ডন হসপিটালে জুনিয়র হাউস অফিসারের চাকরি পেয়ে গেল ইন্দ্রনীল। মেরী প্রায়ই কোন কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে লন্ডন মিউজিয়ামে এলে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা করতো। একটা সাপ্তাহিক ছুটিতে ওরা ট্রাফালগার স্কোয়ারে বসে অনেকক্ষণ সময় কাটালো। ইন্দ্রনীল শুরু করলো, 'দেখ মেরী, আমি তোমার একটা ভারতীয় নাম দিতে চাই, অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

'নিশ্চয় তুমি দেবে। আই হ্যাভ নো অবজেকশন।'

'তোমার নাম আজ থেকে মীরা। জানতো, মীরা আমাদের দেশের বিরাট

একজন কৃষ্ণভক্ত। তিনি একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বহু ভজন গান রচনা করেছেন।'

প্রাইমারী এফ. আর. সি. এস পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে ইন্দ্রনীল মীরার সঙ্গে যোগাযোগটা একটু কমিয়ে দিলো। প্রাইমারী পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন বেরুলো, সেদিন ইন্দ্রনীলের মনটা বড়ই আনচান করতে লাগলো; কখন মীরাকে তার পাশের খবরটা জানাবে। বড়দাকে এই সুখবরটা জানিয়ে একটা চিঠি লিখেই ও মীরাকে টেলিফোন করলো। ফোনের অপর দিক থেকে ভেসে এলো, 'কনগ্রাচু-লেশন। কি করে আমাদের দেখা হবে বলো?'

'তুমি আমার হাসপাতালে চলে এসো। আমি সেল্ফ কন্টেন্ড্ একটা কোয়ার্টার পেয়েছি। দিস্ স্যাটারডে পজিটিভলি, প্লীজ।'

হসপিটাল রিসেপশনে আগে থেকেই ইন্দ্রনীল অপেক্ষা করছিল। মীরা আসতেই তাকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলো।

জাম্বিয়ার একজন ডাক্তার তখন ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সিনিয়ার হাউস অফিসারের কাজ করে। সে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, 'হাই ডক, বেস্ট অফ লাক্।' ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

ইন্দ্রনীল ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'আমি আর পারছি না। আমি তোমাকে আরও নিবিড় করে পেতে চাই।'

'ইন্দ্রনীল তুমি শান্ত হও। আমি তো তোমার। আমাকে এম. এ-টা পাশ করতে দাও। তুমিও ফাইন্যাল এফ. আর সি. এস পাশ করো। তারপর তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো। তুমিই তো আমাকে বলেছ ভারতীয় ছেলে মেয়েরা বিয়ের আগে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে না। আমি মনে মনে তোমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছি। নিছক আবেগের বশে আমার সেই সুন্দর ইমেজটাকে নষ্ট করে দিও না। তুমি আমাকে সাহায্য করো, প্লীজ। ইউরোপীয় সমাজের মেয়ে হয়েও আমি যে একটু আলাদা তা তুমি আমাকে প্রমাণ করতে দাও। মীরা নামটা তুমিই আমায় দিয়েছ। ঐ নামটার সঙ্গে যে পবিত্রতা, যে স্নিগ্ধতা ও আত্মমর্যাদা জড়িয়ে আছে আমাকে তার একটু ছোঁয়া পেতে দাও।'

ইন্দ্রনীল এতক্ষণে কি রকম সম্মোহিত হয়ে পড়েছে মীরার ঐ কথাগুলোতে। শান্ত ধীর ভাবে মীরার গাল দুখানা ধরে বলতে লাগলো, 'আজই আমি দাদাকে চিঠি লিখছি। বাবা, মা বেঁচে নেই। দাদাই আমার গারজেন। বড় কষ্ট

করে আমায় ডাক্তারী পড়িয়েছেন। নিজে তার একমাত্র ভাইকে মানুষ করার জন্যে বেশী লেখাপড়া করার সুযোগ পান নি। সামান্য চাকরি করেন। আমার জন্যে উনি বিয়ে পর্যন্ত করেন নি। আমি জানি না দাদা যদি রাজি না হন তবে আমি কি করবো। দাদাকে তো আমি আঘাত দিতে পারবো না। তবে দাদাকে যতদূর জানি, বোধহয় মত দেবেন।'

পনের দিন পরে দাদার চিঠি এসে গেল। চিঠিখানা সযত্নে এবং ভয়ে ভয়ে খুলে পড়তে লাগলো ইন্দ্রনীল : 'তুমি যে বিদেশিনীর পরিচয় লিখেছ তাতে ওনার পেডিগ্রী সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, তবে বিবাহের পর আমাদের এদেশে এসে নিজেকে এডজ্যাস্ট করার মত ওনার মানসিকতা আছে কিনা আমি জানি না। এ বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার জন্যে নয়, যে দেশের ছেলে তুমি সেই দেশের লোকদের তুমি এদেশে ফিরে সুচিকিৎসা করবে, এটাই আমার একান্ত কাম্য। ভালবাসা নিও। ইতি বড়দা।'

রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল থেকে জুনিয়র রেজিস্ট্রারের চাকরি নিয়ে ইন্দ্রনীল কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি হসপিটালে চলে এসেছে। ফাইনাল এফ. আর. সি. এস পরীক্ষা এসে গেছে। একদিন রয়্যাল কলেজ থেকে একটা খাম এলো। খুলে দেখে সে পাশ করে গিয়েছে। মীরাও ইন্ডোলজীতে পাশ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এখন চললো ভারতীয়পনা শেখার ক্লাশ। প্রত্যেক সাপ্তাহিক ছুটিতে ওরা দুজনে চলে যেতে লাগলো ইন্দ্রনীলের কোন বন্ধুর বাড়ি।

অশোক বোস ওরই একই কলেজের এক বছরের সিনিয়র দাদা। এখন উনি ব্রাডফোর্ডের কাউন্টি হসপিটালের সিনিয়র রেজিস্ট্রার। মীনা মানে অশোকের স্ত্রী, হাওড়ার মেয়ে। মীনা শেখাতে লাগলো কি করে শাড়ী পরতে হয়, কি করে ভাত রাঁধতে হয়, ইত্যাদি। মাস দু তিনের মধ্যে বাঙালীপনা শেখা এবং বাঙালী খানাপিনার অভ্যেস হয়ে গেল মীরার।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীল মীরাকে বলেছে যে তাদের বাড়ি মেদিনীপুরের শালবনী গ্রামে এবং ওখানেই তাদের থাকতে হবে। দাদার ইচ্ছামত ইন্দ্রনীল গ্রামের লোকেদের সেবা করার জন্যে ওর বাড়িতেই একটা সার্জিক্যাল ক্লিনিক করবে। ছোট বাড়ি, কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে। মোচা কেটে তার ঘন্ট রান্না করতে হবে। বাড়িতে কমোড বসানো টয়লেট নেই, স্কোয়াটিং পজিশনে প্রাতঃকৃত্য সারতে হবে।

মীরা মন দিয়ে সব শুনে মানসিক প্রস্তুতি করতে থাকে। ও পারবে, সব পারবে, তার কারণ ওযে ইন্দ্রনীলকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

অশোকদা ও তার স্ত্রী মীনাকে ইন্দ্রনীল নেমন্তন্ন করলো ওদের কার্ডিফের ফ্ল্যাটে। মীরা বাঙ্গালী রান্না করে ওদের খাওয়াল। মীনা খুব খুশী, কারণ রান্না খুব ভাল হয়েছে। মীনার মাস্টারী সার্থক। ওরা দল বেঁধে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গেল। খাতা কলমে ইন্দ্রনীল ও মীরার শুভ বিবাহ শেষ, তবে মালাবদল বাকি। তাও আর বেশিদিন পড়ে রইলো না।

লন্ডন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ সেই সনাতন মন্ত্র 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম' উচ্চারণ করে হিন্দুমতে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন করলেন।

একদিন লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর মীরা ও ইন্দ্রনীলকে বিদায় জানালো 'যাত্রা তোমাদের শুভ হোক' এই বলে।

তারপর দমদম বিমানবন্দর, একটা ট্যাক্সি করে হাওড়া স্টেশন এবং ট্রেনে করে একেবারে শালবনী, ওদের গ্রামে।

বড়দা আগে থেকে চিঠি পেয়ে শালবনীর ছোট্ট স্টেশনে ওদের রিসিভ করলেন। গায়ের চামড়ার রং ছাড়া বড়দা বুঝতেই পারলেন না যে তার প্রিয় ভাই একজন মেম বউ নিয়ে এসেছে সংগে করে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা দিয়ে বড়দাকে প্রণাম করলো মীরা। বড়দা অভিভূত ও স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকার পর তিনি বললেন, 'ওঠ বৌমা ওঠো, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। চল বাড়ি চলো।' তারপর ওরা বাড়ির দিকে রওনা হোলো। সকালে বড়দা বাজার করে আনলেন। মীরা মাছ ভাজলো, আনাজ কুটলো, রান্না করলো। বড়দার অফিসে বেরুবার পাঞ্জাবী, ধুতি, রুমাল, মায় ছাতাটা পর্যন্ত বড়দার হাতের কাছে এগিয়ে দিলো মীরা। বড়দা এ সব দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবেন একজন বিদেশিনীর পক্ষে এও কি সম্ভব!

ইন্দ্রনীল ওদের সদর ঘরটাকে সাজিয়ে চেম্বার করলো। পাশের একটা ঘরে করলো অপারেশন থিয়েটার। দুটো বেড ফেললো বারান্দায়। মেদিনীপুর থেকে ওরই এক বন্ধু এনেসথেটিস্ট প্রায়ই এসে ওর কেস করে যেতো। ধীরে ধীরে ইন্দ্রনীলের পসার জমে উঠলো।

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে মীরা হঠাৎ বলে উঠলো, 'বড়দা ভাবছি আমি একটা স্কুল খুলবো ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের জন্যে। আমাদের বাগানে

সামান্য খরচে একটা শেড্ করে দিন। শ্বনেছি এখানে কোন ইংলিশ মিডিয়াম কে-জি স্কুল নেই। বড়দা, আপনি একটু সময় করে বাংলাটা ওদের পড়িয়ে দেবেন। আমি ইংরিজি ও অন্য সব বিষয় পড়াবো।

বড়দা কি বলবেন ব্ঝতে পারছেন না। কিছ্ক্ষণ চ্প থেকে ইন্দ্রনীলকে হুকুম দিলেন, 'বৌমা যা বললো তার তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা কর।' জান বৌমা, আমি স্কুলটার নাম দেবো 'মেম বউয়ের পাঠশালা'।

যত দিন যেতে লাগলো বড়দা কেবলই ভাবতে লাগলেন এও কি সম্ভব? কিন্তু চোখে যা দেখা যায় তাকে বিশ্বাস করতে হবে। এ বাড়িতে লক্ষ্মীপ্জো মা মারা যাবার পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মীরা আবার সেই প্জো শ্রু করেছে। সে কি ভক্তি, এদেশের মেয়েদের মধ্যেও তা দেখা যায় না।

বছর তিনেক আগে শালবনীতে ভীষণ গ্যাস্ট্রো এনটেরাটিস দেখা দিলো। মীরা ইন্দ্রনীলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলো। টাকাপয়সা ইন্দ্রনীলকে ভগবান মোটাম্টি দিয়েছেন। মীরা ইন্দ্রনীলকে অন্রোধ করলো, 'তুমি এদের কাছ থেকে পয়সা নিও না। এরা বড় গরীব।'

বড়দা একথা শ্নে ইন্দ্রনীলকে বললো, 'জানিস ইন্দ্, আজ আমি সার্থক। বৌমাকে ভাল বলে জানতাম; কিন্তু এতো ভাল তা জানতাম না। বৌমার এই দয়াল্ মন, এই মহান্ভবতার দাম দেওয়া যায় না। ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন।'

গ্রামের সকলে বিশেষ করে গরীব লোকেরা মেম-বৌদি বলতে অজ্ঞান। কার চাল কেনার পয়সা নেই অমনি মেম-বৌদি পাঁচটাকা দিয়ে দিলেন চাল কেনার জন্যে। ছিদেন কিস্কুর মেয়ের বিয়ে, পয়সা নেই কি হবে? ছিদেনের বউ মেম-বৌদির কাছে গিয়ে হাজির। মেম-বৌদি বিয়ের যাবতীয় খরচ দিলেন। নিজে ওদের বাড়িতে গিয়ে পাতা পেড়ে বসে খেলেন। কনেকে আশীর্বাদ করলেন সোনার একজোড়া বাউটি দিয়ে।

মীরা একদিন স্কুলে পড়াতে পড়াতে ব্ঝতে পারলো ও যেন ভালো দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দ্রনীলকে বললো সব কথা। ইন্দ্রনীল কলকাতায় ওরই প্রফেসর ডাঃ ম্খার্জীকে দেখাল। ওনার পরামর্শে মীরাকে নিয়ে চলে গেল মানচেস্টারের ম্রফিল্ড আই ইনফারমারীতে। কিন্তু কিছ্ করা গেল না। অপটিক এ্যাট্রফি। চোখে খ্ব সামান্য দেখা যায়।

বড়দা ম্সড়ে পড়েছেন, কেবলই বলছেন, 'ভগবান তুমি একি করলে'! শালবনী গেলে এখনও দেখা যাবে, ছিদেন কিসকুর বৌয়ের হাত ধরে চলেছেন এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন; 'তোরা সব কেমন আছিস। কিছ্ দরকার হলেই বলবি কিন্তু।'

এক গোছা গ্লাডিওলাস ফুল

মাসটা আগস্ট। গ্রাম বাংলার সেবা করবো বলে সুদূর দার্জিলিঙের এক হাসপাতালে চাকরি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে দার্জিলিঙের বাসে চেপে চলতে লাগলাম ধুপি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে। রাস্তার দু'ধারে কোথাও চা বাগান, আবার কোথাও চাঁপ আর ধুপির ঘন অরণ্য। আবার কোথাও বন-বিভাগের দৌলতে কাটা গাছের শুধু গুড়িগুলো দেখা যাচ্ছে।

সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ দার্জিলিঙের বাস স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালাম। কোথায় উঠব ঠিক নেই। হোটেলের টাউটরা ছেঁকে ধরলো। দর কষাকষি করে নিউ মাউন্ট ভিউ হোটেলে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে টুয়ে চা জলখাবার খেয়ে হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম এবং ঐ দিনই কাজে নাম লেখালাম।

কিছু দিন হোটেলে থেকেই ডিউটি করছি। কিছুদিনের মধ্যেই কোয়ার্টার পাব বলে খবর পেলাম।

প্রথম দিন হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম এখানকার অধিকাংশ রোগীই নেপালীভাষী। অতএব এ ভাষা আমার শেখা বিশেষ দরকার। অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে শুনলাম যে এভাষার সঙ্গে হিন্দি ও বাংলার বেশ মিল আছে, আর তাই এ ভাষা শিখতে খুব অসুবিধে হবে না। এখানকার সিস্টাররা আমাকে খুবই সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁরা বেশীর ভাগই নেপালী। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারদের সঙ্গে কাজ করতে করতে তাঁরা বাংলা ভালই জানেন এবং বলেন। প্রথম প্রথম ওঁরাই দোভাষীর কাজ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আমার কোয়ার্টার ঠিক হয়ে গেল। বাড়ীটা বৃটিশ আমলের। পুরোনো কিন্তু প্রশস্ত। বড় বড় ঘর, প্রায় সব ঘরেই ফায়ার প্লেস, কাঠের মেজে। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান আর বাগানের ভেতর একটা উইপিং উইলো গাছ। গাছের সব পাতাগুলো মাথা নত করে যেন কাঁদছে। আহা, গাছের নামটা সত্যই সার্থক।

একটা একটা দিন কেটে যাচ্ছে। কিছুদিন যাবার পর আমি বড় হোমসিক্ হয়ে পড়লাম; মায়ের কথা, ভাইবোনদের কথা এবং সর্বশেষ বা সর্বোপরি আমার বেটার হাফের কথায় রাতের ঘুম কেড়ে নিল। সব সময় আমার বড় নিসংগ মনে হতে লাগলো। সপ্তাহে তিনচার দিন করে সিনেমা দেখতে লাগলাম। এখানে একটা সুবিধে, দুটি সিনেমা হলে ইভিনিং শোতে কেবল ইংরেজী বই চলে, তাও আবার প্রতি সপ্তাহে দুবার বদলি হয়। অতএব মোটামুটি 'এ' মার্কা বই বেশ-কিছু দেখে ফেললাম।

দার্জিলিঙে সন্ধ্যে কাটানো সত্যিই একটা সমস্যা। দিনের রোদ মিলিয়ে-যাবার সংগে সংগেই রাস্তাঘাটের লোকজন, গাড়িঘোড়াও মিলিয়ে যায়। দোকান-পাটও বেশীর ভাগ বন্ধ হয়ে যায়। সারাটা দিন মোটামুটি কাজের মধ্যে কেটে যায়। যদিও কোলকাতার তুলনায় এখানে কাজকর্ম কম। একজন সহকর্মী বললেন, মশাই এখানে যখন পোস্টিং হয়েছেন তখন রিটায়ার্ড লাইফ যাপন করুন; খান দান আর হট্ব্যাগ কোলে নিয়ে লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোন। তার ওপর মাছি নেই, মশা নেই—কি মজা।

দার্জিলিঙে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, আমিও হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে গিয়ে দেখি একটি সুন্দর পাঁচ বছরের মেয়ে ভর্তি হয়েছে; তার নাম বিষ্ণুমায়া তামাং। ওর কানের পুঁজ থেকে মেনিন-জাইটিস হয়েছে, ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে এবং তার সাথে জ্বর ও বমি হচ্ছে। চললো যমে আর ডাক্তারে টানাটানি। আমি আমার ওয়ার্ডের সিস্টার সুশ্রী নামচুকে বললাম—'এর বাবাকে আমার সংগে দেখা করতে বলবেন—রোগের গুরুত্ব আমি বুঝিয়ে দেবো'।

পরের দিন আবার রাউন্ডে গিয়ে সিস্টার নামচুকে জিজ্ঞেস করলাম—'সিস্টার এর বাবা আসেনি?' সিস্টার নামচু মাথা নেড়ে বললো, না। ভগবানের ইচ্ছায় ঐ ফুটফুটে মেয়েটি ভাল হয়ে উঠলো। কিন্তু এবারে কানের একটা বড় অপারেশন করা দরকার। আর তা না হলে আবার রিলাপ্স করতে পারে। কিন্তু অপারেশনের আগে গারজেনকে খবর দেওয়া দরকার। হাস-পাতালের রেজিস্টারে যা ঠিকানা আছে তা থেকে সদর পুলিশ স্টেশন থেকে খবর পাঠানো হলো। পুলিশ খবর দিল ঐ ঠিকানায়। কিন্তু সেখানে ঐ মেয়েটির বাবা থাকে না। তার মানে এখন থেকে বিষ্ণুমায়া তামাং হল 'আনক্লেমড চাইল্ড'।

আমি হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী সুপারিনটেনডেন্টকে জানিয়ে দিলাম ব্যাপারটা। অপারেশন করতে আর সাহস করলাম না, কে দায়িত্ব নেবে এই ভেবে। ঐ যাত্রায় ছোট বিষ্ণু ভাল হয়ে উঠল। হাসপাতালের সকলে সব কথা জেনে ওই ছোট মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। আমাদের হাসপাতালের ফিজিসিয়ান ভাই টীকার দিন বিষ্ণুকে নতুন জুতোজামা কিনে দিল। ওয়ার্ডবয় এবং অন্যান্য সিস্টাররা কেউ কোনদিন শেল রুটি আবার কেউ ছুরপি আবার বা কেউ লজেন্স বিস্কুট কিনে দিতে লাগলো। বিষ্ণু খুশিতে ডগমগ।

দিন কেটে যেতে লাগল। বিষ্ণুর স্বাস্থ্যও দিন দিন ভাল এবং সুন্দর হয়ে উঠল। একদিন আমাদের স্টাফ ভূমিকা প্রধান আমাকে বললেন,—'স্যার, আমার ছেলে মেয়ে নেই, আমি বিষ্ণুকে মানুষ করব; আমায় ওকে দিয়ে দিন'। আমার মনটা টলে গেল আর ভাবলাম বিষ্ণু মা-বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত এবং ভূমিকাও স্টাফ; যদি তা পূরণ করতে পারেতো ভাল। নিয়ম অনুযায়ী পুলিশ এবং হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে জানিয়ে বিষ্ণুকে সিস্টার ভূমিকা প্রধানের হাতে তুলে দিলাম।

সাতবছর দার্জিলিঙে কাজ করার পর আমার কোলকাতার হাসপাতালে ট্রান্সফার অর্ডার এল। দার্জিলিংকে আমি বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাই যাবার সময় মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। চারিদিকে আমার বদলির কথা রটে গেছে। হাসপাতালের সহকর্মীরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার ব্যবস্থা করলো, আমার জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি শুরু হল। হঠাৎ একদিন সকালে আমার কোয়ার্টারে ভূমিকা স্টাফ একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে উপস্থিত। আমি বসতে বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কি আপনার মেয়ে' ?

ভূমিকা স্টাফ অবাক হয়ে আমাকে বললো—'সেকি স্যার, আপনি আপনার বিষ্ণুকে চিনতে পারছেন না!' আমি কিছুক্ষণ থমকে গেলাম, তারপর অনেক চিন্তা করায় আমার সব কথা মনে পড়লো। বিষ্ণুর হাতে ছিল একগোছা গ্লাডিওলাস ফুল। আমি তা সাদরে গ্রহণ করলাম। বিষ্ণুর এখন বয়স দশ, ফর্সা রং, চমৎকার দেখতে। আমার স্ত্রী বিষ্ণুকে আদর করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খেতে দিল। আমি ভূমিকাকে জিজ্ঞেস করলাম,—'ও কোন ক্লাশে পড়ে ?' উত্তর এলো, 'দার্জিলিং নেপালী গার্লস্ স্কুলে ক্লাশ ফোরে।' আমি ভূমিকাকে বললাম—'মাঝে মাঝে কোলকাতার ঠিকানায় বিষ্ণুর সম্বন্ধে আমাকে

চিঠি দিয়ে জানিও'। আমাদের 'নমস্তে' জানিয়ে বিষ্ণু ও ভূমিকা সজলচোখে বিদায় নিলো। আমাদেরও সেই বিদায়ের ক্ষণটি এগিয়ে এল। চোখ আমাদেরও ঝাপসা হয়ে উঠল। মন কিছুতেই চায়না এই দার্জিলিং-এর বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা ধুপি গাছ আর বহু দুঃখেও মুখে হাসিভরা এখানকার অধিবাসীদের ছেড়ে চলে যেতে। নানান কথা ভাবতে ভাবতে দেখি আমাদের বাসখানা কখন দার্জিলিং ছেড়ে চলে এসেছে।

কোলকাতায় বদলি হলে ভূমিকা বিষ্ণুর সম্বন্ধে জানিয়ে আমায় চিঠি লিখল। বিষ্ণু স্কুলে ভালভাবে পড়াশোনা করছে, ও বেশ বড় হয়ে উঠেছে এবং খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। দেখতে দেখতে বিষ্ণু ষোল বছরে পা দিল। এগার নং গুর্খা রাইফেলসের জওয়ান হরকবাহাদুর তামাঙের সঙ্গে বিষ্ণুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে লাগলো ভূমিকা স্টাফ। একদিন যথা সময়ে ওদের বিয়েও হয়ে গেল। হরকবাহাদুরের বাড়ী সিংথাম টি-এষ্টেটে। ওর বাবা রিটায়ার করেছেন ঐ বাগানের কর্মচারী হিসাবে। একটি বোন, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। ওর মা চা-বাগানেই একটা ছোট দোকান করেছেন চায়ের। মোটামুটি সুখের সংসার। বিষ্ণুর বাবা মায়ের পরিচয়—মা ভূমিকা প্রধান আর বাবা ভূমিকার স্বামী আলোক প্রধান—আমাদের হেল্থ ডিপার্টমেন্টেরই স্টাফ।

বেশ হাসিখুশিতে বিষ্ণুর দিন কেটে যায়। ওর স্বামী হরকবাহাদুরের নাগাল্যাণ্ড পোষ্টিং হল। বিষ্ণু শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে থাকল, আর হরক-বাহাদুর চলে গেল সুদূর নাগাল্যান্ডে। একদিন বিষ্ণু খামে করে একটা চিঠি লিখল আমাকে। খাম খুলে দেখি ওর এবং ওর স্বামীর বিয়ের পর তোলা একটি ছবি। বিষ্ণুকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে বিয়ের সাজে। আমার স্ত্রী আমাদের পারিবারিক এ্যালবামে ছবিটাকে সযত্নে গেঁথে রাখলেন।

কোলকাতায় মে মাসে ভীষণ গরম পড়ছে। আমার স্ত্রীর অনুরোধে গরম কাটাবার জন্যে হাসপাতালে ছুটি নিয়ে দার্জিলিং চলে এলাম। উঠলাম দার্জিলিং-এর আঞ্জুমান গেষ্ট হাউসে। ভূমিকা স্টাফকে খবর পাঠালাম।

একদিন ভূমিকা তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের রুমে দেখা করতে এলো, হাতে নারাণ দাসের দোকানের এক বাক্স মিষ্টি। আমি ভূমিকার কাছে বিষ্ণুর সম্বন্ধে খবরাখবর নিলাম। ও ভালই আছে। আমরা ভূমিকাকে বললাম, 'চলো একদিন বিষ্ণুর শ্বশুর বাড়ি বেড়িয়ে আসি।' ভূমিকা আশা

করেনি আমার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আসতে পারে। এককথায় সে রাজী হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে আমার স্ত্রী, ভূমিকা ও তার স্বামী বিষ্ণুর শ্বশুর বাড়ীতে পেঁছিলাম। ছোট্ট বাড়ী, কিন্তু ছিমছাম সাজানো। বিষ্ণু আমাদের দেখে কি করবে বুঝতে পারছে না। আনন্দে ও ওর শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে এসে আমাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ও আমাদের জন্যে জলখাবার নিয়ে এলো। শেলরুটি, আলুরদম আর চায়ের সংগে বিষ্ণুর নিজের রান্নাকরা তৈরী মাংস। মাংসটার কি সুন্দর স্বাদ হয়েছে।

বিষ্ণুর শ্বশুর একটি সুদর্শন যুবকের সংগে ওদের বাড়ীতেই আলাপ করিয়ে দিল। ছেলেটির নাম প্রেম বাহাদুর লিম্বু। এ হরকবাহাদুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রেমের বাবাও এই চা বাগানের কর্মচারী। ওরা বিষ্ণুদের প্রতিবেশী। প্রেম এই চা বাগানেই চাকরী পেয়েছে। বিষ্ণু বললে, প্রেম আমার স্বামীর সংগে ছোট বেলা থেকে একসংগে মানুষ হয়েছে এবং লেখাপড়া করেছে। আমার স্বামী পল্টনে চলে গেলেন ও আমার বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ী এবং আমাদের দেখা-শোনা করে। প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসে। একেবারে আমাদের ঘরের ছেলের মত। প্রেম আমাদের সকলকে নিয়ে চাবাগান ঘুরিয়ে দেখাল এবং দিনের শেষে সকলকে বিদায় জানিয়ে আমরা আমাদের গেষ্ট হাউসে ফিরে এলাম। ছুটি শেষ হয়ে এল এবং আমরা কোলকাতায় চলে এলাম। বিষ্ণুর সুখের সংসার দেখে আমাদের খুব ভালো লাগলো। বিষ্ণু তার নিজের বাবা মায়ের অযাচিত সন্তান হলেও ভগবান কিন্তু ওকে সুখ ও শান্তি উজাড় করে দিয়েছেন ওর জীবনে।

মাসটা বোধহয় সেপ্টেম্বর হবে। আমি হাসপাতাল থেকে দুপুরে ফিরতে আমার স্ত্রী বলল 'একটা বড় দুঃসংবাদ আছে'। আমি চমকে গেলাম। 'ভূমিকা স্টাফ চিঠিতে লিখেছে, বিষ্ণু গলায় দড়ি নিয়ে মারা গেছে।'

আমি দুপুরে বিষাদে খেতে পারলাম না। ভূমিকা স্টাফ পাঁচপাতা ভরে চিঠিতে সমস্ত ঘটনাটা লিখেছে।

বিষ্ণুর স্বামী হরকবাহাদুরের বন্ধু প্রেম দিনে দিনে বিষ্ণুর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্বামীর অবর্তমানে বিষ্ণু প্রেমের সংগে দার্জিলিং-এ প্রায়ই যেতো এবং রিং ও ক্যাপিট্যাল সিনেমায় সিনেমা দেখত। বিষ্ণুর শ্বশুর শাশুড়ী প্রেমকে ঘরের ছেলের মত বিশ্বাস করত। বিষ্ণুকে প্রেমের সংগে বেড়াতে যেতে

নিষেধ করতেন না। বিষ্ণুও প্রেমকে বড় দাদার মত দেখতো। কিন্তু প্রেমের অন্তরে যে একটা কালসাপ ফণা তুলে আছে বিষ্ণুও কোনদিন বুঝতে পারেনি। হঠাৎ একদিন দার্জিলিং-এর হিমা রেস্টুরেন্টে বসে যখন প্রেম ও বিষ্ণু একটা হিন্দি সিনেমা দেখে চাউ চাউ খাচ্ছিল, তখন প্রেম বিষ্ণুকে বললো, 'চলো আমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি'। বিষ্ণু ভীষণ আপত্তি করে এবং রেগে রেস্টুরেন্ট থেকে একা বেরিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। সেই থেকে বিষ্ণু আর কোনও দিন প্রেমের সংগে বেড়াতে যায়নি। কিন্তু বিষ্ণু এই কথা ওর শ্বশুর শাশুড়ীকে কোন দিন বলতে পারেনি। প্রেম কিন্তু চিনে জোঁকের মত লেগে থাকত। মাসটা মার্চ, তিব্বতীদের এক উৎসবের দিন। দার্জিলিং-এ শীত যেন যেয়েও যাচ্ছে না। সন্ধ্যে হয়, বিষ্ণু গোয়ালঘরে ওদের গরুকে খেতে দিতে ঢুকছে হঠাৎ কে ওকে সজোরে জাপটে ধরল। তার পর সর্বশক্তি দিয়ে বিষ্ণু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ও মাটিতে পড়ে গেল এবং হ্যারিকেনের আলোয় দেখলো শয়তানের মুখ। তার পর যা অঘটন ঘটার তা ঘটে গেল। বিষ্ণু লজ্জায় কাকেও একথা বলতে পারল না। চিন্তায় ভাবনায় দিনে দিনে ও শুকিয়ে যেতে লাগল। এক মাস বাদে বিষ্ণুর হঠাৎ বমি হতে লাগল। বিষ্ণুর শাশুড়ি ওকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হয়েছে'? বিষ্ণু বলল—'না, ও কিছু না! একটু অম্বল হয়েছে!' মাস দুই বাদে বিষ্ণুর স্বামী হরকবাহাদুর পল্টনের বাৎসরিক ছুটিতে এলো। বিষ্ণু সব কথা চেপে হাসি মুখে সংগ দিতে লাগল। তার পর একদিন হরকবাহাদুরের দু মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেল এবং ও আবার কর্মস্থলে চলে গেল। বিষ্ণু বড় স্বামী-সোহাগিনী। তাই সে কেবল ভাবতে লাগল যে তার পাপের বোঝা সে তার স্বামীর উপর চাপাতে পারবে না। একদিন বিষ্ণু একটা চিঠিতে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বিবরণ লিখে সেই চিঠিখানাকে সেফটিপিন দিয়ে ব্লাউজে গেঁথে ওদের গোয়ালঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। পুলিশ এসে মৃত বিষ্ণুর ব্লাউজ থেকে সেই চিঠি উদ্ধার করলো এবং চিঠিতে লেখা দেখল যে প্রেমই বিষ্ণুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। মৃতদেহ সদর হাসপাতালে পাঠানো হল এবং পোস্টমর্টেম করে দেখা গেল যে বিষ্ণু ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

ভূমিকা স্টাফের চিঠিখানা পড়তে পড়তে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আমার স্ত্রী রান্না ঘরে দৌড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি আলমারি থেকে আমাদের পারিবারিক এ্যালবামখানা বার করলাম এবং পাতা উল্টে বিষ্ণু ও তার স্বামীর ছবিখানা বার করে দেখতে লাগলাম। আমার মনে পড়তে লাগল দার্জিলিং থেকে আমার বদলির সময়ের সেই ছোট বিষ্ণু এসেছিল ভূমিকার সাথে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আর হাতে ছিল তার এক গোছা গ্লাডিওলাস ফুল।

ফাদার

ডিসেম্বরের শেষ ক'দিন খুব ঠান্ডা পড়েছে। স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। ডাঃ জয়ন্ত বোস তাঁর স্ত্রী রমার কাছে প্রস্তাব করলো ঃ চলো ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসি। রমা খুব খুশি। সে জয়ন্তকে বললোঃ চলো এবারে কোন অভয়ারণ্যে গিয়ে প্রকৃতির স্নেহের ছায়ায় কয়েকটাদিন কাটিয়ে আসি। জয়ন্ত জলপাইগুড়ির হলং বাংলো বুক করলো।

গোছগাছ হয়ে গেল জয়ন্ত তার অ্যামবাসাডার গাড়ীটা গ্যারেজে পাঠিয়ে দিল একটা ফাইনাল চেক করার জন্যে। ওদের ছেলে উল্লাস তো উল্লাসে উন্দাম, মেয়ে টোটন বয়স পাঁচ, মাকে একেবারে অস্থির করে তুললো 'কবে যাবে, কবে যাবে' কোরে। শেষে একদিন ওরা যাত্রা করলো জলপাইগুড়ির দিকে। এন, এইচ-৩১, অপূর্ব রাস্তা, গাড়ী চললো হাই স্পীডে। জয়ন্ত বিলেতে থাকার সময় গাড়ী চালানোটা রপ্ত করেছিলো। রাস্তার দুধারে চা বাগান, আর্মি ক্যান্টনমেন্ট আর মাঝে মাঝে গভীর অরণ্য পার হয়ে এক সময় হলং বাংলোর সামনে গাড়ী থামালো জয়ন্ত।

রমা ঘোর সংসারী। সে বাচ্চাদের জন্যে আমুল স্প্রে, চিনি মাখন কলা কিছু নুনিয়া চাল, দু'ডজন ডিম, ছোট এক প্যাকেট টেবিল সল্ট সংগে নিয়ে এসেছে। হলং বাংলোর প্রশস্ত ঘরে ঢুকেই আগেই বাচ্চাদের বিছানাটা ঠিক করে ফেললো। তারপর বাংলোর মালীকে বললোঃ আমাদের কিছু রান্না করতে হবে।

মালী বক্‌শিষের লোভে বললো, 'মা আমাকে জিনিষপত্র দিন আমি খানা পাকিয়ে দেবো। আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে আমি মাদারীহাটে গিয়ে আরও কিছু বাজার করে আনবো।

অতএব রাতে ডিম-ভাত আর দুধ খেয়ে ওরা সকলে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল হতেই মালী বংশী (রাজবংশী) ডাকাডাকি শুরু করলোঃ বাবু হাতীর পিঠে চড়ে জংগল বেড়াতে যাবেন? আপনারা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন।

হাতীর পিঠে চড়তে পেয়ে উল্লাস আর টোটনের আনন্দের সীমা নেই। প্রথম-

দিন কোন জন্তুর দেখা পাওয়া গেল না, কয়েকটা বুনো শুয়োর আর হরিণ ছাড়া।

জয়ন্তরা চারদিন থাকবে এই জঙ্গলে। এখানে সারা দিন আর কিছু করার নেই। বংশীকে ডেকে রমা সেদিনের বাজার করতে পাঠাল মাদারীহাটে। হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারছে। জয়ন্ত দরজা খুলে দেখলো একটি সুন্দর মেয়ে, চোদ্দ কি পনের হবে, সলজ্জ মুখে দাঁড়িয়ে। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে : কি চাই তোমার?'

মেয়েটি শান্ত ও নম্রভাবে বলে, বাবা কোথায় গেল? জয়ন্ত অবাক হয়ে বলে, 'কে তোমার বাবা'? মেয়েটি বলে, 'আমার বাবাই তো এই বাংলোর মালী। নাম বংশী।

জয়ন্ত রমাকে ডাকে—'দ্যাখো এসে বংশীর মেয়ে এসেছে ওর বাবাকে খুঁজতে। কি সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে। অনেকটা তোমার মত দেখতে।'

রমা তখন টোটাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, বললো, 'ওকে ভেতরে ডাক। মেয়েটি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে বললো, 'আমার মায়ের ভীষণ অসুখ করেছে। কয়েক-দিন ধরে জ্বর আর বমি হচ্ছে। এখন যেন কিরকম বেহুঁস হয়ে গেছে, তাই বাবাকে তাড়াতাড়ি ডাকতে এসেছি। জয়ন্ত বললো, 'তুমি বাড়ী যাও, বংশী বাজার থেকে এলেই আমি ওকে তোমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মেয়েটি নমস্কার করে চলে গেল।

জয়ন্ত বললো,—'দ্যাখো রমা, মেয়েটি কি সুন্দর দেখতে। বংশীর মেয়ে বলে মনেই হয় না। চেহারাতে খুব বড় বংশের একটা ছাপ রয়েছে।' রমা গম্ভীর হয়ে বললো—'আর আদিখ্যেতা করতে হবে না; বরং বংশী এলে ওদের কোয়ার্টারে গিয়ে ওর স্ত্রীকে দেখে এসো। তুমিও তো অনেক অষুধ এনেছ সংগে। ওর বৌয়ের কাজে লাগবে।' বংশী ফিরতেই জয়ন্ত সপরিবারে গেল ওদের বাড়ীতে। জয়ন্ত ওর স্ত্রীকে ভাল করে পরীক্ষা করলো। 'এ্যকিউট কোলিসিস্টাইটিস মানে পিত্ত থলির প্রদাহ। জয়ন্ত সংগে সংগে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও করে দিলো। বংশী বললো,—'বাবু আমি খুব গরীব আপনাকে কি ফি দোবো?' জয়ন্ত রেগে বললোঃ বৌকে ভাল করে খেতে দিতে পার না আবার আমাকে ফি দেবার কথা বলছো! পকেট থেকে দশ টাকা বার করে বললো, 'যা বংশী একটা ইনজেক্শন্ কিনে নিয়ে আয় এখুনি আমি দিয়ে দেবো।' বংশী ছুটলো হাসিমারায় ওষুধ আনতে কারণ মাদারীহাটে কোন ওষুধের দোকান

নেই। বংশীর মেয়ে চা করে নিয়ে এলো। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে : তোমার নাম কি? সে বললো,—'পদ্ম।' জয়ন্ত বললোঃ দেখো পদ্ম, তোমার বাবা ওষুধ নিয়ে এলে আমাকে বাংলোয় খবর দিয়ো, তখন এসে আমি তোমার মাকে ইনজেকশন দেবো।' জয়ন্ত ও রমা ফিরে গেল বাংলোয়।

দিনরাত তিনদিন ধরে চিকিৎসা করে বংশীর স্ত্রী সুস্থ হলো, তবে বড় দুর্বল। ভাল পথ্য দিতে উপদেশ দিল জয়ন্ত। দুপুরে রোদে বাংলোর বাইরে লনে বসে ছিলো জয়ন্ত। বংশী এসে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলল না—'বাবু আপনি যা করলেন পদ্মর মার জন্যে তা আমি জীবনে ভুলবো না। আমি চিরদিন মনে রাখবো।' জয়ন্ত বললো 'আচ্ছা, বংশী তোমার মেয়ে ভারী সুন্দর দেখতে, বিয়ের বয়েস তো হয়েছে। ওর একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিও।' বংশী বলে—'বাবু, আমি বড় গরীব আর আমাদের রাজবংশী জাতে কোথায় লেখাপড়া জানা ভাল ছেলে পাবো! আপনি এত ভাল লোক বাবু, আপনার কাছে আমি কিছু গোপন করব না। বাবু, এই পদ্ম কিন্তু আমার নিজের মেয়ে নয়। আমাদের ছেলেপুলে হয়নি তাই আমার বৌ-এর খুব সখ আনি কাকেও পুষ্যি নিই। বীরপাড়ায় একটা মিশনারীদের হাসপাতাল ছিল। সেখানে এক সিস্টার নাম ফ্লোরেন্স মাদার, তিনি ডেলিভারী করতেন আর তার কাছে কোন আইবুড়ো মেয়ে ঐ হাসপাতালে পদ্মর জন্ম দিয়ে পদ্মকে ফ্লোরেন্স মাদারের কাছে রেখে চলে গিয়েছে। আমি ফরেস্টে চাকরি করার আগে ঐ হাসপাতালে পিওনের কাজ করতাম। মাদার আমাকে ঐ পদ্মর লালনপালনের ভার দেন আর সেই থেকেই পদ্মই আমাদের সব। ফ্লোরেন্স মাদার মারা যাবার পর সেই হাসপাতাল উঠে গেল আর আমি এই ফরেস্টের চাকরি নিলাম।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে শোনে এই কথা। ছুটি শেষ হয়ে গেল আর জয়ন্ত সপরিবারে ফিরে গেল শিলিগুড়িতে ওদের বাড়ীতে।

হলং থেকে ফেরার পর রমা যেন কিরকম হয়ে গেছে। একটা খিট্‌খিটে ভাব। উল্লাস ও টোটনকে সামান্য অন্যায় করলে মারধোর করে। একদিন জয়ন্ত রমাকে জিজ্ঞেস করলো—'রমা, তামার কি হয়েছে। তুমি তো এরকম কোনদিন ছিলে না!' রমা নিরুত্তর থাকে, রমার মুখ দেখলেই যেন মনে হয় ওর বুকের মধ্যে কোথাও ব্যথা লুকিয়ে আছে। ও কিছু বলতে চায়। একদিন রবিবার দুপুরে উল্লাস ও টোটন পাশের বাড়ীতে খেলতে গিয়েছে।

জয়ন্ত ধরে বসলো, 'রমা তুমি বলো, তোমার কি হয়েছে !'

খুব পীড়াপীড়িতে রমা বললো,—'তুমি যদি কথা দাও, তুমি কিছু মনে করবে না বল, তুমি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না, বকাবকি করবে না আমার কথা শোনার পর, তবেই আমি বলবো আমার কুমারী জীবনের কথা।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে বললো—'বিশ্বাস করো আমি তেমন কিছুই করবো না।'

রমা বলতে শুরু করেঃ "আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্রী এম. এ. ক্লাসে। আমার সহপাঠী বিমান বোস ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। সে ছিল সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। রং ফর্সা, লম্বা, মিষ্টভাষী। আমি ওর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হই। একবার বিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল, সেই থেকে ওকে আমি স্যামসন বলে ডাকতাম। ওর বাবা ছিলেন মালদা কোর্টের উকিল। ও ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে থেকে পড়তো। প্রথম প্রথম ও আমাকে খুব একটু পাত্তা দিতো না।

ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের একটা স্টাডি টুরের ব্যবস্থা হলো আগ্রাতে। আগ্রাতে আমরা আগ্রা হোটেলে উঠলাম। বিমান বললো আমি একটা একস্ট্রা খরচ দিয়ে সিঙ্গল বেডেড রুম নেবো। আমি ডাবল বেডেড রুমে থাকবো না। বিমানের ব্যাপার একটু অলোদা, বড়লোকের ছেলে সে। পরের দিন আমরা আগ্রা ফোর্ট বেড়াতে গেলাম। যে অলিন্দ দিয়ে বন্দী অবস্থায় সাজাহান যমুনার অপর পারে অবস্থিত তাজমহল দেখতেন সেখানে দাঁড়িয়ে বিমান বলছে—'আমি কিন্তু ঔরঙ্গজেবকে পছন্দ করি। তার কারণ তাঁর ছিল অদ্ভুত চারিত্রিক দৃঢ়তা। তিনি মদ খেতেন না। গোঁড়া ধার্মিক। কোরান পাঠ করে নিজেকে ধর্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এতদিন তাঁর পিতৃপুরুষ যে ভোগবিলাস ও নারীলিপ্সাতে জীবন কাটাতেন, তার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেশ থেকে মদ খাওয়া নিষেধ করলেন এবং রাজপ্রাসাদ থেকে বাঈজীদের দিলেন বিদায়। স্থাপন করলেন লালকেল্লার মধ্যে মতি মসজিদ।'

সব সহপাঠীরা বললো—দ্যাখো বিমানের সব কিছু আচার ব্যবহার, চিন্তা-ধারা অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইতিহাসের অধ্যাপক সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখতে লাগলেন। রাত আটটার মধ্যে ডিনার সেরে যে যার ঘরে চলে গেল। মেয়েদের জন্য ঠিক হয়েছিল একটি ডরমিটার।

আমরা আটজন মেয়ে ওখানে এক সংগে থাকতে লাগলাম।

বহুদিন ধরেই আমি বিমানকে নিজের করে পেতে চেয়েছি। আজ সম্রাট শাজাহানের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর মমতাজের প্রতি অমর প্রেমের কথা কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছে।

রাত তখন প্রায় একটা হবে। কিছুতেই আমার ঘুম আসছে না। বিমানকে আমার চাই একেবারে অন্তরঙ্গ করে। আমার রুমমেটরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি সন্তর্পণে নাইটি পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। সতর্কভাবে বিমানের ঘরের দিকে চলতে লাগলাম। আস্তে করে বিমানের দরজায় টোকা মারলাম। পরে আরো একটু জোরে দরজায় ধক্কা মারলাম। আমার বুকের মধ্যে একটা ভয় যেন ছটপট করে উঠলো, এই বুঝি কেউ দেখে ফেললো। হঠাৎ বিমান দরজা খুললো এবং আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললো—একি রমা, এত রাত্রে! আমি বললাম—'চুপ, ঘরের ভেতর চলো'। ঘরে ঢুকেই আমি দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। বিমান বিমূঢ় হয়ে একটু পিছিয়ে গেল। আমি কিন্তু নির্লজ্জের মত বিমানকে সজোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ওর ঠোঁটে চুম্বনের আলপনা এঁকে দিলাম আর বললাম—'দ্যাখো স্যামসন, ডেলাইলা তোমার জন্যে পাগল। তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না। তুমি আমাকে আপন করে নাও।' বিমানও যেন কিরকম হয়ে গেল। দুজনে আমরা বিছানায় একত্রে একাকার হয়ে গেলাম। ডেলাইলা স্যামসনের দমবন্ধ করা নিবিড় আলিঙ্গনে নিষ্পেশিত হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বিমানের দৃঢ় আলিঙ্গন শিথিল হলো। সে আমার পাশে শুয়ে পড়লো। সহসা যেন আমরা কিরকম চুপ চাপ হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, বিমানই প্রথম কথা বললো—'রমা, একি হোলো!' আমি বললাম—'কেন, আমি যা চেয়েছিলাম। তাই হয়েছে। আমি তোমাকে পেয়েছি।' বিমান বললো,—'সমাজ তো এটাকে অত সহজভাবে নেবে না, তুমি যেভাবে নিচ্ছ।' আমি বললাম—'তুমি তোমার বাড়ীতে আমাকে স্ত্রী হিসাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো, আশাকরি তুমি সে সাহস রাখো।'

বিমান যেন তড়িতাহত হয়ে বললো, 'দেখি কি করা যায়! আমি আমার মা, বাবাকে চিনি, প্রথমে হয়তো একটু আপত্তি করবেন, পরে মনে হয় রাজি হয়ে যাবেন। কোলকাতা ফিরে মা বাবাকে প্রস্তাবটা দেবো। এখন তুমি তোমার ঘরে যাও, কেউ দেখে ফেলবে।'

আমি ফিরে গেলাম আমার ঘরে। ক্লান্তি আর অবসাদে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো।

আমরা সকলে স্টাডিটুর শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এলাম। ক্লাশ শুরু হয়ে গেল। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। পড়ুশুনো ভালই চলতে লাগলো। বিমানের মোটর বাইকে করে আমি আর বিমান একটা রবিবার চলে গেলাম চন্দননগরে বেড়াতে। গঙ্গার ধারে স্ট্রান্ডে বসে আমরা কত গল্পই না করলাম। আমি বললাম, 'দেখ স্যামসন, ক'দিন হোলো আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। সব সময় একটা বমি বমি ভাব। তুমি তাড়াতাড়ি একটা কিছু করো।'

—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বাড়ীতে আমি আমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা দেবো।'

আমি বললাম, 'আমার বিয়ের জন্য বাবা, মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি কিন্তু লজ্জায় আমাদের ব্যাপার বলতে পারছি না।'

বিমান বলে, 'ও চিন্তা তোমার নয়। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

শরীরটা আমার কয়েকদিন খুব খারাপ লাগছে। দুদিন আমি ইউনিভারসিটি যেতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলা সাতটা নাগাদ আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড অনিতা টেলিফোন করলো, 'রমা তোর কি হয়েছে? ক্লাশে আসিসনি কেন।' আমি বললাম, 'কয়েকদিন ধরে শরীরটা খারাপ যাচ্ছে।' অনিতা বললো, 'শোন একটা খুব খারাপ খবর আছে, বিমানের মোটর বাইকে এক্সিডেন্ট হয়েছে। পি. জি. হাস-পাতালে আছে। অবস্থা খুব খারাপ।'

আমি স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ অবস্থায় টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। রাতটা যে কিভাবে আমার কেটেছে, কি বলবো। পরের দিন পি. জি. হাসপাতালে গেলাম বিকেল চারটা নাগাদ। এনকোয়ারিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম ও মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। পাগলের মত খুঁজে বার করলাম বিমানকে। ঐ সুঠাম চেহারা যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। অক্সিজেন, ড্রিপ অবস্থায় মাথায়, হাতে আর বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা, ওকে চেনাই যায় না। বিমানের পাশে ওর মা-বাবা বসে পাথরের মত। আমি বেশীক্ষণ আর থাকতে পারলাম না। তিনদিন বাদে বিমান আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল আর রেখে গেল আমার পেটে ওরই সন্তান।

বাড়ীতে মা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে রমা, ক'দিন ধরে তুই যেন কিরকম হয়ে গেছিস।' আমি বললাম, 'কিছু নয়, এমনি। ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল, বসলাম

পরীক্ষাতে, কিন্তু ফেল করলাম। কিছুদিন বাদে মাকে সব কথা খুলে বললাম। মা শুনে হতবাক। বাবাকে মা সব বললো। বাবা, মা দুজনেই আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। আমার উপর রাগ করা দূরের কথা সহানুভূতি যেন বেড়েই গেল। কিন্তু অবিবাহিত মেয়ের সন্তানকে তো সমাজে কেউ গ্রহণ করবে না। মহাবিপদ সামনে। আমি বিমানের সন্তানকে নষ্ট করতে নারাজ। বাবার এক বাল্যবন্ধু প্রবীর কাকাবাবু বীরপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার। ওনার কোন সন্তান হয়নি। কাকীমা অনেকদিন হোলো গত হয়েছেন। আমাকে প্রবীরবাবু নিজের মেয়ের মত ভাল বাসতেন। বাবার চিঠিতে সব কথা জেনে কাকাবাবু নিজে এসে আমাকে বীরপাড়া নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন ফ্লোরেন্স মাদারের হাসপাতালে বিমানের মেয়ের জন্ম হলো। আমি মা হলাম, সমাজের চোখে অবাঞ্ছিত মা। প্রবীর কাকাবাবু ফ্লোরেন্স মাদারকে সব কথা খুলে বললেন এবং এই ছোট্ট শিশুকে কিছুদিন ওনার হাসপাতালে রেখে দিতে চাইলেন। বললেন, একটু বড়ো হলেই আমি নিয়ে যাবো। সমাজের ভয়ে সমস্ত মায়া মমতাকে জল গুলে দিয়ে আমি আমার পেটের মেয়েকে ছেড়ে কোলকাতায় বাবা মার কাছে চলে এলাম।

কোলকাতায় ফিরে সব সময় আমার মনে হতে লাগলো, আমি বড় একা, এই পৃথিবীতে যেন আমার কেউ নেই। মনের মধ্যে আমি ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। দিনে দিনে আমি যেন কি রকম শুকিয়ে যেতে লাগলাম। মা বাবা ভাবনায় পড়লেন। আমাকে বললেন, 'রমা, দিনরাত চিন্তা করে শরীর খারাপ করছিস কেন? সমাজের ভয়ে তোকে পুরোনো সব কথা ভুলতে হবে। তুই বরং বিয়ে কর। তোর মতের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করবো না। তুই রাজী হলে আমরা তোর সুপাত্রের খোঁজ করবো।' দিন কেটে যেতে লাগলো আর নিঃসঙ্গতা যেন আমাকে পাগল করে তুললো। শেষে আমি একদিন আমার বিয়ের দেবার অনুমতি দিলাম। ইতিমধ্যে একদিন বীরপাড়া থেকে টেলিগ্রাম এলো প্রবীর কাকাবাবু করোনারী থ্রম্বোশিস রোগে মারা গেছেন। বাবা বীরপাড়া গেলেন প্রবীর কাকাবাবুকে শেষ দেখা দেখতে এবং সেই সঙ্গে আমার মেয়েকে লালন পালন করার জন্যে মাদার ফ্লোরেন্সকে মাসিক টাকা নিতে অনুরোধ করলেন। মাদার ফ্লোরেন্স সহানুভূতির সঙ্গে বাবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

এর পরের ঘটনা জয়ন্ত তুমি সবই জানো। একদিন তুমি আর তোমার

বৌদি আমাকে দেখতে এসেছিলে কোলকাতায়। দেখেই তুমি আমাকে পছন্দ করলে এবং আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।"

সমস্ত ঘটনা শোনার পর জয়ন্তর কোন ভাবান্তর হলো না। সে সহজ ভাবেই রমাকে বললো, 'দ্যাখো রমা, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি এবং তোমার সব কিছুর ওপর আমার দাবি রয়েছে। অতএব তোমার অবিবাহিত অবস্থার সন্তান, সে যারই হোক, আমার তার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আমি কালই হলং যাবো এবং তোমার পদ্মকে আমার নিজের করার জন্য যা চেষ্টা করতে হয়, তাই করবো।'

তখন দুপুর বোধহয় একটা হবে। বংশী ভূত দেখার মত জয়ন্তকে দেখলো তার বাড়ীর দিকে আসতে। বংশী তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে জয়ন্তকে অভ্যর্থনা করলো, 'আসুন বাবু, আসুন। কি খবর সব, খুকী আর খোকাবাবু ভাল আছে তো ? মেমসাহেব কেমন আছেন' ? জয়ন্ত বলে, 'সবাই ভালো আছে। তোমার বৌ কেমন আছে বংশী ?' বংশী বললো, 'ভাল আছে বাবু, আমার বৌ আর পদ্ম আমার শালীর বাড়ী তোর্ষা চা বাগানে গেছে। আজই এসে যাবে।'

জয়ন্ত বলে, 'বংশী, আজই আমি শিলিগুড়ি ফিরে যাবো। তার সংগে একটা আলোচনা করতে এসেছি। দ্যাখ, পদ্মকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তুই পদ্মকে আমায় দিয়ে দে। পদ্মকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে ওর একটা ভাল ছেলে দেখে আমি বিয়ে দেব। তুই তো গরীব লোক, তোর পক্ষে হয়ত ভাল ছেলে পাওয়া সম্ভব হবে না।'

বংশী বললো, 'পদ্মকে মাদার ফেন্নারেন্সের কাছ থেকে নিয়ে আসার পর থেকে ও আমাকে বাবা আর আমার বৌকে মা বলে জানে। বড় মায়া পড়ে গেছে বাবু। ওকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না।' জয়ন্ত বললো, 'বংশী, পদ্মকে দেখার পর থেকে ওকে আমার বড় ভাল লেগে গেছে। ও আমার মেয়ের মত। ওর সব দায়িত্ব আমি নেবো। তুই ভেবে দেখিস।'

বংশী বললো, 'আমি কথা দিতে পারবো না বাবু, আমি আপনার কথা আমার বৌকে বলবো। কিন্তু পদ্ম মনে হয় আমাদের ছেড়ে যাবে না।'

জয়ন্ত চলে যাবার আগে বংশীকে বললো, 'বংশী, তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম, তুমি ভেবে দেখো আর আমাকে চিঠি দিয়ে জানিও।'

সপ্তাহ খানেক বাদে বংশীর চিঠি এলো, হাতের লেখা অন্য কারও। সে

লিখেছে, "বাবু আমার বৌয়ের সংগে আলোচনা করেছিলাম এবং আমি নিজেও অনেক চিন্তা করেছি। আমরা পদ্মকে ছাড়তে পারব না, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমাদের স্নেহের পদ্মকে বিক্রী করতে পারবো না। আমাদের ক্ষমা করবেন বাবু। প্রণাম নেবেন।"

চিঠি পড়ে জয়ন্ত মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলো। জয়ন্ত তার এক বন্ধু অসিতবাবু শিলিগুড়ি কোর্টের উকিল। অসিতবাবুর সংগে, পদ্মকে কিভাবে নিজের অধিকারে আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা করলো।

অসিতবাবুর পরামর্শ মত জয়ন্ত জলপাইগুড়ি কোর্টে নিজেকে পদ্মর বাবা বলে পরিচয় দিয়ে একটা কেস ফাইল করলো। বংশীকে কোর্টের সমন দেওয়া হলো। বহুদিন ধরে কেস্ চললো। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়াতে জয়ন্ত কেসে হেরে গেল। প্রবীর কাকাবাবু অনেকদিন মারা গেছেন, যিনি ফ্লোরেন্স মাদারের কাছে রমাকে পদ্মর জন্ম হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স মাদারও বহুদিন গত হয়েছেন, যিনি বংশীকে পদ্মর লালন পালনের ভার দিয়েছিলেন। পদ্ম যে রমার গর্ভজাত, এর সাক্ষী ছিলেন প্রবীর কাকাবাবু আর ফ্লোরেন্স মাদার। অতএব তঁাদের সাক্ষী ছাড়া জয়ন্তর কেস জেতা অসম্ভব।

বংশী এই কেস্ লড়তে তার সর্বস্ব শেষ করে ফেলেছে। মাসখানেক হলো সে রিটায়ার করেছে। খুবই কষ্টে ওদের সংসার চলছে।

জয়ন্ত চেয়েছিলো পদ্মর বাবা হতে, কিন্তু আইন তাতে বাদ সাধল। সে কিন্তু বিবেচক। বংশীকে সে ভালবাসে তার কারণ এতদিন সে পদ্মকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, মানুষ করেছে এবং সে সমাজে পদ্মর বাবা বলে পরিচিত।

রমা জয়ন্তকে সান্ত্বনা দেয়, 'দেখ তুমি আমার অবিবাহিত জীবনের সন্তান পদ্মকে পাবার জন্যে কি চেষ্টাই না করলে, কিন্তু তুমি তাকে পেলে না। তুমি দুঃখ করো না।' জয়ন্ত বললো, 'রমা, আই ওয়ানটেড টু বি হার ফাদার।' রমা বললো, 'তুমি ওর বাবা নও, তুমি তোমার সামাজিক সম্মানকে তুচ্ছ করে, যে তোমার কেউ নয়, তাকে তোমার পিতৃ পরিচয় দিচ্ছ, এর কি কোন দাম নেই? তুমি আমাকে ভালবেসে আমার কলঙ্ককে তুমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিজের করে নিতে চাইছো। এর চেয়ে বড় মহানুভবতা আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার মতে তুমিই হলে ওর রিয়েল ফাদার।'

জয়ন্ত বললো, 'কিন্তু রমা, পদ্মকে আমায় পেতেই হবে আমার করে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

রমা বললো, 'বেশ তো তুমি বংশী আর ওর স্ত্রীকে বুঝিয়ে ওদের সকলকে পদ্মর সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আনো। ভগবানের কৃপায় আমাদের তো অভাব নেই। বংশীও তো আজ পদ্মকে ভালবাসার জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই বিপদে আমরা ছাড়া ওদের আর কেউ নেই।'

জয়ন্ত রমার কথা শুনে যেন পায়ের তলায় মাটি পেল। সে বললো, 'রমা আমি কালই মাদারীহাট গিয়ে বংশীর সঙ্গে দেখা করবো।' বংশী রিটায়ার করে মাদারীহাটে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে আছে। চারদিকে ধার দেনা। জয়ন্ত গিয়ে পেঁছুলো ওদের বাড়ী। বংশী রাস্তার ধারে একটা চা দোকান করেছে। কোনভাবে যোগাড় হচ্ছে ওদের দুমুঠো ভাত। জয়ন্ত সোজা বংশীকে প্রস্তাব করলো, 'বংশী তুমি সত্যিই পদ্মর বাবা, কিন্তু এ তুমি কি করলে। পদ্মকে ভালবেসে তুমি নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেললে। বংশী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো আর বললো, 'বাবু আমি পদ্মকে ছাড়তে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। আমি মরে গেলেও পারবো না।'

জয়ন্ত বললো, 'বংশী, আজ আমি এই জন্যেই এসেছি। তোমাকে, তোমার বৌকে আর আমাদের পদ্মকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে। আমার কোন অভাব নেই। তোমাদের পদ্ম তোমাদেরই থাকবে। খালি পদ্ম আর তোমরা আমার বাড়ীতে আমাদের নিজেদের একান্ত আপনার জনের মত থাকবে। এই বুড়ো বয়সে তোমাকে আর এত কষ্ট করতে দেবো না। দ্যাখ বংশী তুমিও যেমন পদ্মর বাবা সেই রকম আমিও কি ওর আর একজন বাবা হতে পারিনা?'

বংশীর অশ্রু যেন আর থামে না, সে বলে 'নিশ্চয় বাবু, আমি আপনার অনুরোধ আর অমান্য করবো না। পদ্ম আর আমার বৌকে ডেকে পাঠাই। আজই আমরা যাবো আপনার সঙ্গে। জয়ন্ত উন্মাদের মত বংশীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললো, 'সত্যি যাবে তোমরা সকলে আমার সঙ্গে?'

বংশী বললো, 'হাঁ বাবু, সত্যি যাবো।' জয়ন্তর এ্যামবাসাডার গাড়ীখানা তীরবেগে ছুটে চলল শিলিগুড়ির দিকে। সঙ্গে আছে পদ্ম, বংশী আর তার স্ত্রী। সবার মুখেই ফুটে উঠেছে একটা প্রশান্তির রেখা বহুদিন পরে।

সম্মোহন

অরুণাভ চৌধুরী গোয়া মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করে মীরামার বীচে নিজেদের বাড়ীতেই একটা নার্সিং হোম খুলেছে। প্র্যাক্‌টিস মোটামুটি ভালই হচ্ছে। অরুণাভের বাবা অমল চৌধুরী বিরাট কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। টিম্বলোস্‌ কোম্পানীর আয়রণ ওর মাইন্‌সের কাজ নিয়ে বহুদিন আগে কলকাতা ছেড়েছেন। ভালই মাইনে পান।

তদানীন্তন পর্তুগীজ সরকার ওকে খুব খাতির করতেন। অরুণাভ অমল বাবুর একমাত্র সন্তান। তাই অরুণাভকে আর বাইরে যেতে দেননি। মীরামার বীচে বিরাট বাড়ী করেছেন অমলবাবু এবং সেখানেই অরুণাভ প্র্যাক্‌টিস করছে। সাগরের সুন্দর হাওয়া আর সী ফিশ্‌ খেয়ে অরুণাভ বেশ স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন। অরুণাভ বিয়ে করেছে ওরই গোয়া মেডিকেল কলেজের ক্লাশ ফ্রেন্ড নিনিতে ডসাকে। মেয়েটি ভারী মিষ্টি ও সুন্দর। নিনিতের বাবা গোয়ার বিরাট ধনী। তবে ওরা ধর্মে খৃষ্টান। ওদের বিয়েতে প্রথম অরুণাভের মা এবং অমল বাবু রাজী হননি, পরে ঘটা করেই অরুণাভ ও নিনিতের বৌভাত হয়েছিল।

অরুণাভ এবং নিনিতের প্রেম ঘটেছিল এক অদ্ভুৎ ঘটনার মধ্যে দিয়ে। একদিন ওরা সমস্ত ফোর্থ ইয়ারের ছেলেমেয়ে মিলে গোয়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া মান্‌ডোভি নদীতে ষ্টীমার পার্টি করতে গিয়েছিলো। হঠাৎ নিনিতে বলে উঠলো, 'কে সাঁতার কেটে মান্‌ডোভি নদী পেরুতে পারে?' অরুণাভ সত্যিসত্যিই এই দুঃসাহসিক কাজে রাজি হয়ে গেল। জলে ঝাঁপ দিল অরুণাভ। আরব সাগর থেকে সদ্য ঢোকা মান্‌ডোভি নদী বেশ চওড়া এবং ওতে বেশ বড় বড় ঢেউও আছে। নিনিতে মনে মনে ভীষণ ভয় পেলো এবং সেইসংগে সে যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো যেন অরুণাভ নিরাপদে নদী পেরুতে পারে। নিনিতের প্রার্থনা সার্থক; অরুনাভ মান্‌ডোভী পার হয়ে নিজের মান রক্ষা করলো।

এতদিন অরুণাভকে আমলই দেয়নি নিনিতে, কিন্তু আজ সে চায় অরুণাভকে নিবিড় করে পেতে। তখন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ওদের ডিউটি চলছে। নিনিতে হঠাৎ অরুণাভকে সিস্টারস রুমে ইসারায় ডাকলো। নিভৃতে নিনিতে অরুণাভকে বললো, 'দেখ অরুণাভ, কাল রবিবারে চলো আমরা একসঙ্গে কোথাও যাই !' অরুণাভ আশা করেনি যে নিনিতে এ কথা তাকে বলতে পারে। এক কথায় রাজি হয়ে গেল অরুণাভ। বাড়ীতে দুজনেই বলে এলো যে রবিবারে তাদের স্পেশাল ক্লাশ আছে। ওরা দুজনে সকাল দশটায় পাঞ্জিম বাস স্ট্যান্ডে এসে পেঁছুলো এবং সেখান থেকে ভাস্কো-ডা-গামা শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। ভাস্কো-ডা-গামাতে পেঁছে ওরা একটা ভালো রেস্টুরেন্টে উঠলো। নিনিতে ধনীর মেয়ে। প্রচুর টাকা নিয়েও বেরিয়েছে। সব খরচ নিনিতেই করতে লাগলো। রেস্টুরেন্টের কেবিনে নিনিতে অরুণাভর ঘনিষ্ট হ'ল এবং বললো, 'দেখ অরুণাভ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই।'

অরুণাভ চমকে উঠে বলে, 'দেখ নিনিতে, তুমি খৃষ্টান আর আমরা হিন্দু। আমার মা রোজ লক্ষ্মী পুজো করে। আমি মা, বাবাকে এ প্রস্তাব দিতে সাহস রাখি না।' নিনিতে কঠিন হয়ে বলে, 'জানো অরুণাভ, তুমি দুর্দান্ত মানডোভি নদী সাঁতার দিয়ে পার হবার সাহস রাখো আর আমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা তোমার বাড়ীতে দিতে সাহস হচ্ছে না। তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তোমাকে পারতেই হবে।'

অরুণাভ কি করবে বুঝতে পারে না। ও নিনিতেকে বলে, 'চলো সন্ধ্যে হয়ে এলো, পাঞ্জিমে ফিরতে হবে, বাস বন্ধ হয়ে যাবে।' সেদিন দুজনেই দ্বিধাগ্রস্ত মনে বাড়ী ফেরে। পরের রবিবার ওরা ক্যালানগুট বীচে বেড়াতে যায়। ওখানে সমুদ্র সৈকতে বসে নিনিতে বলে, 'দেখ অরুণাভ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বিয়ের পর আমি আর চুল বব করবো না, লিপস্টিক মাখবো না, গাউন পরবো না, আমি কোন দিন আর চার্চে যাবো না। আমি তোমাদের হিন্দু ঘরের লক্ষ্মীমন্ত বৌ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। তুমি তোমার মাকে আমায় হিন্দুদের আচার ব্যবহার শিখিয়ে নিতে বোলো।'

অরুণাভ আরব সাগরের ঢেউ দেখতে দেখতে বলে উঠলো, 'নিনিতে তুমি পারবে এসব করতে ?'

নিনিতে নিশ্চিন্তভাবে বলে উঠলো, 'নিশ্চয় পারবো।'

অরুণাভর সাহস নেই যে একথা বাবাকে বলে। সে মাকে একদিন সব কথা খুলে বললো। মা চমকে উঠে বললো, 'তুই আমাদের একমাত্র সন্তান, তুই খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করবি? না না, তা হয় না।'

সেই থেকে অরুণাভ সব সময়ই খুব অন্যমনস্ক থাকে। বাড়ীতে রাত্রি করে ফেরে। সেদিনটা মাঘী পূর্ণিমা। সেজেগুজে অরুণাভ সকাল দশটা নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং নিনিতের সঙ্গে হোটেল ফিডালগোর সামনে দেখা করলো। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা সোজা চলে গেল সান্তা দুর্গামায়ের মন্দিরে এবং পুরো হিন্দু মতে ওরা বিয়ে করলো। নিনিতে সেদিন বেনারসী শাড়ি পরেছে, ঘোমটা দিয়েছে এবং সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়, একটা ট্যাক্সি করে অরুণাভ তার নব পরিণীতা বধূকে নিয়ে হাজির হলো ওদের বাড়ীতে। অরুণাভর বাবা, মা তখন ড্রইংরুমে বসে ছিলেন। অরুণাভ তখনও ঘরে ঢুকতে পারেনি ভয়ে এবং সংকোচে। ডাঃ নিনিতে চৌধুরী এ বাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারী ডাঃ অরুণাভ চৌধুরীর স্ত্রী হিসাবে প্রবেশ করলো ওদের ড্রইংরুমে। একটি বাঙ্গালী মেয়ের মত সচ্ছন্দভাবে অরুণাভর বাবা এবং মাকে প্রণাম করলো। নিনিতের অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখে অরুণাভর বাবা, মা মুগ্ধ। অসংকোচে তাঁরা পাশে বসালেন। নিনিতে বাংলা জানেনা, সুন্দর ইংরাজীতে বললো, 'মা, বাবা আপনারা আমাকে ও আপনার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন। অরুণাভ আমাকে বিয়ে করেছে। আপনাদের অমতে এই বিয়ে করাতে আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন।'

অরুণাভের বাবা অমল বাবু তাড়াতাড়ি অরুণাভকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলো। নিনিতের রূপ আর মিষ্টি কথাবার্তা অরুণাভর বাবা-মাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তাই তাঁরা ওদের বিয়েটাকে এত সহজে মেনে নিলেন। অমল-বাবু সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিলেন।

চললো নিমন্ত্রণের পর্ব। গোয়ার মানডোভি হোটেলে হোলো বিরাট ম্যারেজ পার্টি। এই পার্টিতে অমলবাবু নিনিতের মা, বাবাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। দিনে দিনে নিনিতে একেবারে হয়ে উঠলো বাঙ্গালী বধূ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা শিখে ফেললো। সংসারের কাজের ফাঁকে সে অরুণাভকে সাহায্য করতে লাগলো তার নার্সিং হোমে। শিবরাত্রির দিন নিনিতে ওর শাশুড়ী

অরুণাভর মাকে নিয়ে নিজে গাড়ী ড্রাইভ করে মাংগেশ শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে এলো। অরুণাভের মা যখন বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো করতো তখন পুজোর সব যোগাড় করে দিতো নিনিতে।

নিনিতে বিয়ের আগে পর্যন্ত ওর বাবা, মার সংগে প্রতি রবিবার যেতো ব্যাসিলিকা অফ বম জেসাস চার্চে প্রার্থনা করতে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আর কোনদিন ও চার্চে ঢোকেনি। অরুণাভর বাবা, মা নিনিতেকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতে শুরু করেছেন। নিনিতের ডাক্তারী পড়াই হয়েছে কিন্তু সে সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সব কিছুই যেন উৎসর্গ করেছে।

একদিন রাত্রে অরুণাভ নিনিতেকে ওদের শোবার ঘরে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললো, 'নিনিতে, তুমি গোয়ার মেয়ে, তার ওপর ডাক্তার। তুমিও কি সম্মোহন বিদ্যেটা রপ্ত করে মা, বাবাকে বশ করেছ? গোয়ার সেই বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার এ্যাবে-ফেরিয়া, যিনি সম্মোহনের দ্বারা বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতেন, তুমি তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলে। আজও ডাঃ এ্যাবে ফেরিয়ার স্ট্যাচুটা পাঞ্জি শহরের বুকে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। নিনিতে আমি ধন্য। তুমি তোমার রূপ ও গুণে বাবা-মাকে জয় করেছো, আমাদের সংসারে এনেছ শান্তি আর আনন্দ।'

———

স্মৃতির ছেঁড়া পাতা

মানপত্রটা অবশেষে ড্রইং রুমের দেয়ালে টাঙানো হোলো। পেরেক পোঁতাটাও একটা বিরাট আর্ট। একটা পেরেক লাগাতে দেয়ালটা একেবারে মৌচাকের আকার ধারণ করেছে। বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের নখটার বারটা বেজে গেছে। বার বার হাতুড়ির ধাক্কা খেয়ে আঙুলটা কলাগাছ না হলেও একটা ছোট কাঁঠালী কলার চেহারা নিয়েছে।

'আপনার অমায়িক ব্যবহার আমাদের প্রীত করেছে। আপনার নম্র ব্যবহার এবং বিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এইসব গুণই আপনাকে করেছে অজাতশত্রু। আপনার অবসর জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।'

মানপত্রের কথাগুলো পড়তে খুব ভাল লাগছে ডাঃ অপূর্ব রায়ের।

সহকর্মীদের দেওয়া পারকার পেন সেটটা সযত্নে আলমারিতে তুলে রাখলো অপূর্ব। প্রয়াত স্ত্রী রমার ছবিটার কাছে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে অপূর্ব আপনমনে বলতে লাগলো, 'শুনছো গো, আজ আমি অবসর নিলাম। মনে আছে তোমার। আমাদের কত প্ল্যান্ ছিল? কাশী গিয়ে শেষ জীবনটা ওখানে কাটাবো। আমার বড় একা লাগছে গো। এতদিন সময়টা কাজের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম। তোমার শূন্যতাটা অনেকখানি সময় ভুলে থাকতাম। কিন্তু এখন কি করবো।'

কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি চশমাটা খুলে চোখদুটো পুঁছতে লাগলো। কাপড়জামা খুলে লুঙ্গিটা পরে খালি গায়ে একটা বেতের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লো বারান্দায়। শরীর মন যেন গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে।

পাশের বাড়ীর ছেলে বাবলু মানে অমিয় বোস কলেজ থেকে ফিরছে, অপূর্বকে দেখে বলে উঠলো, 'কি কাকাবাবু একা বসে আছেন। বাবা বলছিলেন আপনি নাকি আজ রিটায়ার করেছেন। খুব খারাপ লাগছে নিশ্চয়। যাক একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে, আমি মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছে অ্যানাটমিটা

পড়ে যাবো। খারাপ লাগলে আমাদের বাড়ী চলে আসবেন। বাবা তো আজ দু বছর রিটায়ার করার পর থেকে কেবল লিখে যাচেছন। কিন্তু কোন প্রকাশক বা সম্পাদক খুব একটা বাবাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। তবু বাবা দমবার পাত্র নন। উনি কলম চালিয়েই যাচ্ছেন। সময়টা অবশ্য কেটে যাচ্ছে।'

বাবলু গ্রেজ অ্যানাটমির বইটা কাঁধে করে বাড়ীর দিকে চলে গেলো। ছেলেটি ভাল। মেডিক্যাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ওকে দেখে অপূর্বর মনে পড়ে গেল ও যেদিন প্রথম মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেছিলো সেদিনকার কথা।

একটা লিজার পিরিয়ডে কলেজ ক্যান্টিনে ঢুকলো ও। পাশে বসে ছিলেন দুজন সিনিয়র দাদা। তার মধ্যে একজন মানে ভাদুড়ী দা শুরু করলেন, 'এই ছোকরা, তোকে ডাক্তারী পড়তে কে পাঠিয়েছে? কাল থেকে আর কলেজে আসবি না। অন্য লাইন ধর।'

এই কথাতে অপূর্ব কি রকম ভড়কে গেল। মুখ ওর পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। ওর এই অবস্থা দেখে ভাদুড়ি দা বললেন, 'বোস; এখানে বোস। আমাদের দুজনের জন্যে একটা করে মামলেট আর চায়ের অর্ডার দে।'

ভয়ে ভয়ে অপূর্ব অর্ডারটা দিয়ে দিলো। এরপর থেকে ঐ ভাদুড়ীদা আর অসীম দা উত্তরকালে অপূর্বর অনেক আপদে বিপদে সাহায্য করেছিলেন। এই ঘটনাকে যদি র‍্যাগিং বলতে ইচ্ছে হয় তবে বোধ হয় বেমানান হবে না।

অপূর্বর বেশ মনে পড়ে, গাইনি ওয়ার্ডে ডিউটি করার সময় রোগীদের ইতিহাস লেখার ওপর জোর দিয়ে প্রফেসর মুখার্জী একটা গল্প বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন, 'দেখো তোমরা রোগীর হিস্ট্রিটা ভাল করে লিখবে কারণ এর ওপর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা অনেকটা নির্ভর করছে।'

ফ্রান্সে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সারা ফরাসী দেশে একজন বিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার কারণ তিনি সন্তান সম্ভবা মাকে বলে দিতে পারতেন যে ওনার ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

আসলে উনি কিন্তু জ্যোতিষী ছিলেন না। উনি প্রথম যখন কোন সন্তান সম্ভবা মাকে পরীক্ষা করতেন তখন হিস্ট্রি শীটে একটা যায়গায় লিখে রাখতেন যে এই মায়ের ছেলে হবে। কিন্তু মাকে মুখে বলতেন উল্টোটা, মানে মেয়ে হবে।

সন্তান প্রসবের পর যদি ছেলে হলো তবে তো মিটেই গেল। মা বাবা দু-জনে মিলে একটা বিরাট কেক উপহার দিয়ে গেল। আর মেয়ে হলে কেউ কেউ হয়তো ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হতেন এবং ডাক্তার বাবুর যে ভুল হয়েছে সেটা হলফ করে বলতেন।

ঐ ডাক্তারবাবু কিন্তু ওনার হিস্‌ট্রি শীটটা তখনই বার করে বলতেন—কই আমার কার্ডে তো লেখা আছে আপনাদের মেয়ে হবে। তখন অভিযোগকারীরা ফাঁপরে পড়তেন এবং বলতেন—'ক্ষমা করবেন, বোধহয় আমাদেরই শুনতে ভুল হয়েছে।'

এই গল্পটা সত্যিই সকলের খুব কাজে লেগেছে এবং সকলেই রোগীদের ইতিহাস লিখনে খুব যত্নবান হয়েছে।

অপূর্বর আজ বেশ মনে পড়ছে, প্রফেসর চ্যাটার্জী অর্থপিডিক আউটডোরে ক্লিনিকস নেবায় সময় কোমরের হাড়ের কাছে চোট-পেয়েছে এমন একটি বাচচাকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ছাত্রকে বললেন। ছাত্রটি বললো, 'লামবো সেক্রাল রিজিয়নে একটা হাড় ভাংগা আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। একটা এক্সরে করা দরকার।' প্রফেসর চ্যাটার্জী অবশ্য বললেন, 'আমার দেখে হাড় ভেংগেছে বলে মনে হচ্ছে না ; যাই হোক তুমি যখন বলছো একটা এক্সরে করা হোক।'

বাচ্চাটির মা বললেন, 'দেখুন একটু ভাল করে। কোমরের কাছে ঐ ফোলা যায়-গাটায় বাড়ীর সবাই টিপে দেখছে আর বলছে ওখানাকর হাড় ভেংগেছে।'

প্রফেসর চ্যাটার্জী বললেন, 'আপনারা ঐ জায়গাটায় বেশী টিপবেন না।' এই বলে উনি আমাদের সকলকে একটা গল্প বললেন, 'শোন সবাই, বিলেতে ট্রলি করে একজন ফলওয়ালা ফল বিক্রি করছে রাস্তায়। লোকে যত না কিনছে তার চেয়ে বেশী ফল গুলো টিপে টিপে দেখছে। দিনের শেষে ঐ ফলওয়ালা যখন বাড়ী ফিরলো ও দেখলো যে ওর অনেক ফল ঐ টেপার জন্যে পচে গেছে।

ও অনেক ভেবে পরের দিন ওর ট্রলির সামনে একটা প্লাকার্ড টাঙিয়ে দিলো যাতে লেখা আছে, 'আমার ফল কেউ টিপবেন না। যদি কেউ একান্তই টিপতে চান তবে আমার ট্রলির নারকোলগুলি টিপুন।'

মেডিকেল আউটডোরে ডিউটি করার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিলো। একজন রোগীকে পেচ্ছাব ও পায়খানা পরীক্ষা করার জন্য বলা হয়েছিলো। সেতো একটা হর্লিক্সের শিশি করে তার যতটা পায়খানা হয়েছিলো সবটাই ধরে এনে

ছিল। একটা পুরোনো স্পিরিটের বড় বোতোলে তার সকালের প্রথম পেচ্ছাবটার সবটাই এনে টেবিলের ওপর রাখলো। সবাই তো হেসে লুটোপুটি। দোষটা নিশ্চয় ডাক্তারের, তার কারণ কতটা আনতে হবে তা বলা হয়নি।

একজন বিহারী রোগীকে বুকের ফটো তুলবার কথা বলা হয়েছিল। সে পরের দিন তিনখানা পাশপোর্ট সাইজের নিজের ফটোগ্রাফ নিয়ে হাজির করলো।

'নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত রোগীদের একটু পরিস্কার করে সমস্ত ডাক্তারী কথাগুলো সোজা রোগীদের বোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ; তাহলে আর এই বিপত্তি হয় না।' এ কথাগুলো মেডিসিনের অধ্যাপক বুঝিয়ে বলতেন।

রাজাবাজার বস্তি থেকে ইমারজেন্সিতে একটি রোগী এলো। মহিলাটির মাথায় টিন পড়ে গিয়ে অনেকখানি কেটে গিয়েছে। বেশ খানিকটা চুল কেটে সেলাই করতে হবে। মহিলাটির স্বামী ভীষণভাবে আপত্তি করতে লাগলো, 'বাল-কাটনেসে দেখনে মে খারাপ হো যায়গা। বাল নেহি কাটকে সিলাই কিজিয়ে।'

ইমারজেন্সি অফিসার ডাঃ মন্ডল খুব রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমারা তো বহুত সৌন্দর্য বোধ হ্যায়। আভি বাল কাটনে দেও। কুছ দিন বাদ ফিন বাল গজায়গা।'

অবশেষে চুল কেটে সেলাই করতে স্বামী মশায় রাজী হয়ে গেলেন।

একবার একজন রোগীর একটা বড় অপারেশন হবে। কিন্তু রোগীটির কোন আত্মীয় স্বজনের দেখা নেই। প্রফেসর অফ সার্জারী ডাঃ পাল কয়েকজন ছাত্রকে বললেন ব্লাড ডোনেট করতে। বি গ্রুপ ব্লাড লাগবে পাঁচ বোতল। বি গ্রুপের পাঁচজন ছেলে সকলে ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে হাজির। সিনিয়ার হাউসসার্জেন অলকদা টিম লীডার হয়েছেন। ব্লাড ডোনেশনে বেশ সময় লাগছে। অনেকেই সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই হাতে করতেই অলোকদা হই হই করে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই, তোমরা ব্লাড দেবার আগে কেউ সিগরেট খাবে না। এখন সিগারেট খেলে ব্লাডে নিকোটিন কনটেন্ট বেড়ে যাবে।' ঘন্টা আড়াই পর সকলের রক্ত টানা শেষ হলে অলোকদা আমাদের সিগারেট খেতে আদেশ দিলেন। একটা সিগারেট খেলে রক্তে কতই বা নিকোটিন বেড়ে যাবে তা আজও অপূর্ব বুঝতে পারেনি।

একবার দুপুর দুটো হবে বোধহয়, কলিকাতা সায়েন্স কলেজে থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি জিপে করে প্রফেসররা একটি রোগী নিয়ে এলেন। রোগীটি

একজন রিসার্চ স্কলার। কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করছিলো। কস্টিক সোডা লিক্যুইড দিয়ে কি যেন গবেষণা। একটা বিকারে করে খাবার জল রাখা ছিলো ফ্রিজে। অপর একটা বিকারে ঐ কস্টিক সোডাকে গবেষণার জন্যে ঠান্ডা করা হচ্ছিলো সেই ফ্রিজে। হঠাৎ ঐ ছেলেটি তেষ্টা পেতে ভুলে কস্টিক সোডার বিকারে চুমুক মারলো।

যমে মানুষে টানাটানি চলতে লাগলো। রাত দুটোর সময় ছেলেটি মারা গেল। অসাবধানতা বশত একটা অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

একবার দুটি আগুনে পোড়া রোগী এলো। রাত তখন এগারোটা হবে। ভদ্রমহিলাটি ছেলের দুধ গরম করছিলেন স্পিরিট ল্যাম্পে। হঠাৎ কিভাবে কাপড়ে আগুন লেগে যায়। ভদ্রমহিলার স্বামী ঘুম থেকে উঠে পড়েন এবং স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে উনিও ভীষণভাবে দগ্ধ হন। আত্মীয়রা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

ভদ্র মহিলার মুখের চামড়া মাংসের থেকে ছাড়ানো অবস্থায় ঝুলছে। ভদ্রমহিলা বারে বারে বলছেন, 'আমি খুব দেখতে সুন্দর ছিলাম। আমি আবার আমার সৌন্দর্য ফিরে পাবো তো? ডাক্তার বাবু আমার স্বামীকে একটু ভাল করে দেখুন। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ও খুব পুড়ে গিয়েছে।'

ভদ্র মহিলাকে একতলার ফিমেল ওয়ার্ডে এবং ভদ্রলোককে দোতলার মেল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলো। ভদ্রলোক দুদিন বাদে মারা গেলেন। ভদ্রমহিলাকে একথা জানানো হলো না। ভদ্র মহিলা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন—তাঁর স্বামী কেমন আছেন। ডাক্তার এবং আত্মীয়স্বজনরা মিথ্যে করে ওনাকে বলতেন যে উনি ভাল আছেন। মাস দুয়েক বাদে ভদ্রমহিলা ভাল হয়ে উঠলেন। চারিদিকে পোড়া ক্ষতের দাগ ভদ্রমহিলার সুন্দর চেহারাকে বীভৎস করে তুলেছে। প্লাস্টিক সার্জন বললেন, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো অপারেশন করে ওর চেহারাটা আবার সুন্দর করে তুলতে।'

ভদ্রমহিলা কিন্তু তখনও জানেন না যে তার স্বামী আর ইহজগতে নেই। আত্মীয় স্বজনরা ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামীর ওয়ার্ডে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতে দিতেন না। বলতেন, 'ডাক্তারবাবু এই অবস্থাতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ওয়ার্ডে তোমার স্বামীকে দেখতে যেতে বারণ করেছেন।'

একবার ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ডিউটি করার সময় একজন সাপে কাটা রোগীকে

নিয়ে এলো। ডান পায়েব চেটোতে সাপে কেটেছে। পাড়ুছেঁড়া দিয়ে খুব জোরে কাটার ওপরের অংশে বেঁধেছে।

যারা ডিউটিতে ছিল তারা তাড়াতাড়ি করে ডাক্তারীর নিয়ম অনুযায়ী বাঁধনটা ডান উরুতে বাঁধলো।

রোগীর সংগীরা যে সাপ কেটেছিল সেটাকে মেরে একটা হাঁড়ি করে এনেছিলো। এতে সাপ চিনে চিকিৎসার সুবিধে হয়েছিলো।

একবার একজন তার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে এলো। সে বললো, 'দেখুন আমার বাচ্চাব ভীষণ জ্বর হয়েছে।'

'আপনি থার্মোমিটার দিয়ে কি দেখেছেন?'

লোকটি বললো, 'হাঁ দেখেছি। নব্বুই জ্বর।' সবাই মনে মনে হাসলো তাব কারণ সাধারণ থার্মোমিটারে সর্বনিম্ন চুরানব্বুই-এর নিচে তাপ মাপা যায় না।

অপূর্বর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের একটা অভিজ্ঞতা মনে পড়ে। রোগীরা ডাক্তারকে যখন ফি দেয়, না গুণে বা ভাল করে না দেখে যে ডাক্তার পকেটে ঢুকিয়ে দেয় সে কিন্তু রোগীদের কাছে খুব ইজ্জত পায়। আর যে ডাক্তার টাকাটা গুণে গুণে দেখে নেয় যে কিন্তু অনেকেরই কাছে চসমখোর বলে বিবেচিত হয়।

অপূর্ব কিন্তু তার মক্কেলদের কাছে প্রেস্টিজ রাখার জন্যে ফি-এব টাকা না গুণে বা না দেখে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে কয়েকবার ঠকেছে। বিশেষ করে পঞ্চাশ টাকার নোট বেশ কয়েকটা ছেঁড়া পেয়েছে। ওগুলোকে চালাতে ওর বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অপূর্ব মাঝে মাঝে ভাবে দোকানে বাজারে যখন মানুষ কিছু কেনে তখন বিক্রেতা টাকাগুলি ভাল করে দেখে শুনে তবেই ক্যাসবাক্সে ঢোকায়, তখন কিন্তু ঐ সো-কল্ড ইজ্জতের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এই সূত্রে অপূর্বর মনে পড়ে যায় ওদেরই প্রফেসর অফ মেডিসিনের কথা। ঐ অধ্যাপক মশায় খুবই তিরিখ্যে মেজাজের ডাক্তার বলে বিবেচিত ছিলেন। ওকে একটা রোগীদেখার জন্যে একবার অপূর্ব কল দিয়েছিলো। এ ঘটনাটা বেশ পুরোনো। সেই সময়টাতে কয়েনের খুব চল ছিলো। রোগীর অভিভাবকের ছিল মুদিখানা দোকান। বেশ অবস্থাপন্ন, তিনি অধ্যাপক ডাক্তারকে একশো আঠাশ টাকার কয়েন দিলেন।

অধ্যাপক মশায় কয়েন কিছুতেই নেবেন না। ওনি বললেন, আমাকে নোট দাও। সে কি হুজ্জুতি। অপূর্বর খুব খারাপ লাগছিল। সে ভাবছে যে ওর মাস্টার মশাই-এর ব্যবহারে না ভবিষ্যতে ওর মক্কেল হাত ছাড়া হয়ে যায়। যাই হোক শেষে ডাক্তারবাবুকে নোট যোগাড় করে দেওয়া হলো।

অধ্যাপক মশায় বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যবহারটা তার ভাল হয়নি। উনি একদিন অপূর্বকে বাড়ীতে ডাকলেন। অপূর্ব পেঁছুলে মাস্টার মশাই ওর কম্পাউন্ডারকে হুকুম দিলেন, 'সুরেন ওই অচল টাকার ধামাটা বার করতো।'

সুরেন ধামাটা নিয়ে এলো। মাস্টার মশায় বলতে লাগলেন, 'দেখ অপূর্ব, কত অচল টাকা। প্রায় আটশো টাকা হবে। প্রথম জীবনে প্রাকটিসের সময় টাকা না দেখে পকেটে পুরে আমার এই লোকসান। অতএব জনপ্রিয় ডাক্তার হয়ে টাকা না দেখে পকেটে ঢোকালে অনেকেরই এই অবস্থা হবে।'

অপূর্ব মাস্টার মশায়কে বললো,—'হ্যাঁ স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন।' হঠাৎ, চা জল খাবার এলো। ওই সব সুখস্মৃতি আপাততঃ স্থগিত রেখে অপূর্ব ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। অপূর্ব তার কাঁঠালী কলার মত ফুলে ওঠা বুড়ো আঙুলের কোন ব্যথাই অনুভব করলো না।

———

উজ্জ্বল ভবিষ্যত

'মাসিমা এক গ্লাস ফ্রেস জল দেবেন'

নবেন্দু বললো। আমার মা এক গ্লাস জল দিল নবেন্দুকে। ও আবার বলল, 'মাসিমা কিছু মনে করবেন না, জলটা খুব ভাল জায়গায় রাখা ছিল তো ?'

আমার মা বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে খাও, কিছু হবে না।'

এই নবেন্দুর বাবা মা এখন মনট্রিয়লে থাকে। আসলে ওর মা বীথিকা আমাদের পাড়ার মেয়ে। বীথিকা ছোট্ট বেলা থেকে পড়াশোনায় খুব ভাল মেয়ে ছিল। মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস পাশ করে ওরই ক্লাশফ্রেন্ড অম্লান মানে ডাঃ অম্লান দত্তের সংগে বিয়ে হলো। বিয়ের পর ওরা বিলেত গেল। অম্লান এফ. আর. সি. এস করছে আর বীথিকা প্যাথোলজিতে স্পেশালাইজ করছে। লণ্ডন থেকেই ভাল চাকরী পেয়ে ওরা কানাডায় চলে যায়। আজ প্রায় চোদ্দ বছর হল ওরা ওখানেই আছে। প্রচুর পয়সা এবং অফুরন্ত কাজ করার সুযোগ।

নবেন্দু ওদের একমাত্র সন্তান। ওর বয়স বার হবে। মনট্রিয়লে পাবলিক স্কুলে পড়ত।

বীথিকা ওখানকার সমাজের ছেলে মেয়েদের ঢলাঢলি দেখে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছে একেবারে হাওড়ার রামকেষ্টপুরের অন্ধ গলিতে। এখানে স্কুলে ভর্তি করেছে। আমার সেজ ভাই-এর কাছে প্রাইভেট পড়তে আসে।

নবেন্দু ছেলেটি ভাল। কিন্তু ওর মুখ দেখে আমার মনে হলো জন্ম সূত্রে কানাডার সিটিজেন হয়ে আমাদের হাওড়ার পরিবেশে ওর বেশ কষ্ট হচ্ছে। হাওড়ার মত নোংরা শহরে হাঁফিয়ে উঠেছে। প্রায়ই ওর শরীর খারাপ হচ্ছে, বিশেষ করে পেটের অসুখ ওকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে।

আমাদের এখানকার রোগ জীবাণুগুলো ওর নিখাদ শরীরের কোষ গুলিকে খুব ভালবাসে। তাই ওরা অন্যদের চেয়ে ওর শরীরে বাসা বাঁধতে খুব পছন্দ করে।

নবেন্দুর দিদিমা রোজ নাতিকে আমাদের বাড়ীতে আমার ভাই-এর কাছে

পড়তে নিয়ে আসেন। নবেন্দুর দিদিমা আবার মায়ের ফাগ। ছোট বেলায় এক দোলের দিনে এই দুই বুড়ি ভদ্র মহিলা মাথায় আবির মাখিয়ে দুজনে ফাগ পাতিয়েছিলো।

আমার মা নবেন্দুর দিদিমাকে বললেন, 'হাঁগো ফাগ, তোমার নাতির তো প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্ছে, বীথিকাকে ওকে ফিরে নিয়ে যেতে বলো।'

নবেন্দুর দিদিমা বললেন, 'আমি বীথিকাকে চিঠি লিখেছি তুই এসে তোর ছেলেকে নিয়েযা। এখানে ও থাকলে খারাপ হবে। তুই ওর জন্মস্থানে নিয়ে যা।'

মাসখানেক বাদে বীথিকা এলো আমাদের বাড়ী। আমি বীথিকাকে বললাম 'তোমার ছেলে যে এখানে ফিস আউট অব ওয়াটারের মত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ও কিছুতেই নিজেকে এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশে এ্যাডজাস্ট করতে পারছে না।'

বীথিকা আমায় বলতে শুরু করলো, 'বড়দা ওদেশের ছেলে মেয়েরা ভীষণ আধুনিক। নৈতিক বস্তু বলে ওদের কিছু নেই। হয়তো সেন্ট পারসেন্ট ছেলেমেয়ে তা নয়, তবুও ভয় হলো আমার ছেলে যদি সংগদোষে নষ্ট হয়ে যায়। ও দেশের ছেলে মেয়েদের ডেটিং, পার্টি, পিকনিক একটা দুরন্ত উচ্ছৃংখলতা।'

আমি শুরু করলাম, 'বীথিকা তুমি কিছু মনে করো না। ওদের সব কিছুকে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে একদিন খুব ভাল বলে এদেশে না ফিরে ওখানেই সেটল করলে। তোমার বাবার অসুখের সময় পাড়ার প্রতিবেশীরা হাসপাতালে ভর্ত্তি করল এবং মৃত্যুর পর শ্মশানে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে দাহ করলো। তোমরা টেলিগ্রাম পেয়ে শ্রাদ্ধের সময় এলে, অথচ তোমার বাবার তোমাদের নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। আমার মেয়ে জামাই ডাক্তার। ওরা এখন কানাডাতে সেটেল্ড। কথাগুলো বলতে এবং শুনতে খুবই ভাল। কিন্তু বীথিকা তুমিই বলো এটা কি ছেলেমেয়ের কর্তব্য হলো?

তোমার বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। ওনারা স্কুলে একই সংগে পড়তেন। তোমার বাবা একবার তোমাদের সংগে করে আমার ডাক্তার খানায় আলাপ করতে এনেছিলেন। মনে হয় সেই সময় তোমরা কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে এসেছিলে। আমি তোমাদের বলেছিলাম এখানে এসে আমাদের হেলথ সারভিসে জয়েন করতে। কিন্তু জামাই আমায় বলেছিলেন যে আমার নিজের

দেশের লোককে চিকিৎসা করবো এই সেন্টিমেন্ট ছাড়া এখানে কি আছে? না আছে পয়সা, না আছে নতুন নতুন গ্যাজেট আর মডার্ণ চিকিৎসার সুযোগ। হাসপাতাল গুলো এক্সট্রিমলি ডার্টি। আমি চুপ করে শুধু শুনেছিলাম। তার কারণ জামাই যা বলেছিল তা সবই অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য।

তোমরা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ওদেশকেই বেছে নিলে কর্মক্ষেত্র হিসাবে। খুব ভাল কথা। কিন্তু ছেলের নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্যে কেবল বেছে নিলে নিজের দেশকে। এই দু নৌকায় পা রেখে নিজের সন্তানের জীবনকে করে তুললে দুর্বিসহ। বেচারীর অবস্থা এখন না-ঘরকা না-ঘাটকা। জান বীথিকা, ওদেশের সমাজের ভালটা যেমন তোমরা ভালবাসছো, খারাপটাকে ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ না করে চোখ বুজে সহ্য কর। ছেলেকে ওখানেই রেখে নিজেরা একটু গাইড করো, তাহলেই হবে।

এই তো আমার ক্লাসফ্রেন্ড রঞ্জন মানে রঞ্জন দাশ একজন ইঞ্জিনীয়ার। ও এখন গ্লাসগো-তে সেটেল্ড। ওর ছেলে ওখানেই পড়ে। ছেলেকে বাঙালী কালচার শেখাবার জন্যে ও নিজে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে খুঁজে খুঁজে বাঙ্গালী পরিবার গোটা ব্রিটিশ আইল্যান্ডে কোথায় কোথায় আছে তার খবর নিয়েছে। ওরা উইক এন্ডে এক একজনদের বাড়ীতে একটা গেট টুগেদার করে।

ঐ দিনটাতে কেউ ইংরাজিতে কথা বলে না। মেয়েরা শাড়ী ছাড়া কোন ফ্যান্সী ড্রেস পরে না। দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও সরস্বতী পুজোর আয়োজনও হয় খুব জাঁকজমকে। এইভাবে যতটা পারা যায় ভারতীয় ঘরাণাটা একটু ধরে রাখা এবং সেটা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত করা আর কি।

আসলে বীথিকা, আমি বলতে চাইছি ভাল-মন্দ মিশে একটা সমাজ। ওদের সমাজে বাস করে পুরোপুরি ভাবে ও দেশের সব কিছুর সংগে তোমরা মিলতে পারছ না। বোধহয় ঐ মিলনের মানসিকতাটা তোমাদের ডেভেলপ করে নি। আর এর জন্যেই সৃষ্টি হচ্ছে এই পৃথিবীতে এথ্নিক প্রবলেমস। একমাত্র আমেরিকা এটাকে সামলে নিয়েছে। পাঁচ মিশেলি জাত হয়েও ওরা রেসিয়াল গন্ডির মধ্যে, নিজেদের আটকে রাখে না। ওরা সবাই বলে আমরা আমেরিকানো।

বীথিকা সব শুনে বললো, 'আপনি যা বললেন সব খুবই সত্যি বড়দা। আমি খুব শীগগিরই আমার ছেলেকে ওদেশে ফিরে নিয়ে যাব। আর বছর দুই ওখানে থেকে আমরা সকলেই এখানে ফিরে আসবো। টাকা পয়সা অনেক রোজগার করেছি দুজনে যা হয়েছে তা দিয়ে এখানে একটা নার্সিং হোম করবো।"

আমার খুব আনন্দ হলো। আমাদের এই গলির মেয়ে ফিরে আসবে এখানে। ওদের কাছে এই গরীব লোকগুলো হয়তো একটু সুচিকিৎসার সুযোগ পাবে।

ভাবনা আবোল তাবোল

সন্তের চায়ের দোকানটাকে ইদানিং পাড়ার সকলে নাম দিয়েছে 'মিনি পার্লামেন্ট অফ প্রসন্ন দত্ত লেন।' অতুল বোস মারা যাবার পর বাই ইলেকশনে জয়লাভ করে মোনামিত্তির জানালার ধারের সিটটা দখল করে বসলেন।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বহু বছর বাড়ির বাইরে থেকেছে মিত্তির দা। বিয়ে-থা করেননি। ঘরে উনসত্তর বছরের বুড়ি মা ঝি চাকরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে কোনভাবে আতপ চাল, সন্ধোক নুন আর কাঁচকলা ভাতে খেয়ে বেঁচে আছেন। বলে বলে মুখ ভোঁতা করে ফেললেও মিত্তিরদাকে কিছুতেই সাত পাকে বাঁধতে পারেনি কেউ। এর জন্য দায়ী অবশ্য মাসিমা নিজেই। জাত খোয়াবার ভয়ে পাড়ার বিজয় মুখুজ্যের মেয়ে শিবানীর সঙ্গে মিত্তিরদার বিয়ে দিলেন না। মিত্তিরদা বিরহবেদনায় কাতর হয়ে ঠিক করলেন আর বিয়ে সাদি নয়। চাকরী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে প্রভু জগন্নাথের রথের চাকার মত ঘুরতে লাগলেন, ওড়িশার দিকে। হাজার হোক শিবপুর বি. ই. কলেজের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সেরা ছাত্র ছিলেন মিত্তিরদা। দু'মাস হলো রিটায়ার করে রোজ সকালে সন্তের চায়ের দোকানের চা না খেলে মিত্তিরদার প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ আসে না।

খবরের কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে মিত্তির বলে উঠলেন, 'ও শান্তিদা মস্কোতে ভারত উৎসবের খবর পড়েছেন? ক্রেমলিনে কোন বিদেশী রাজনীতিবিদদের স্ট্যাচু বসানো হয়নি আজ পর্যন্ত। সেই জায়গায় ইন্দিরা গান্ধী ব্রোঞ্জের শাড়ী পরে হাত তুলে সবাইকে হৃদয়ের ভালবাসা জানাচ্ছেন।'

শান্তিদা উত্তর দিলেন, 'রাশিয়া আমাদের পরমবন্ধু, এই প্রীতির শুরু হয়েছিল সেই নেহেরু সাহেবের আমলে যখন একদিকে আমেরিকা খালি চেঁচাচ্ছে কাশ্মীর হচ্ছে পাকিস্থানের, কাশ্মীরে গণভোট করা হোক; ওখানকার লোকেরা পাকিস্তানে যাবে না হিন্দুস্থানে থাকবে তা তারা জানাক। এইরকম একটা অবস্থায় রাশিয়া তার চরম অস্ত্র ভেটো মারল রাষ্টসঙ্ঘের হল ঘরে, শুধু একবার নয় দুবার, তিনবার, চারবার। আমেরিকার লম্ফ-ঝম্ফ স্তব্ধ হয়ে গেলো। এই

দেখে নেহের্ সাহেব দোস্তির হাত বাড়ালেন রাশিয়ার দিকে। আমাদের ইন্দিরাজী ওনার পিতাঠাকুরের সংগে ঘুরে এলেন রাশিয়ায়। ইন্দিরাজীর রূপ দেখে রাশিয়ানরা মুগ্ধ। পরে যখন এই ইন্দিরাজী ভারতের রাণী হলেন তখন রাশিয়া-বাসীদের আনন্দ আর ধরে না। বন্ধুত্ব আরো ঘন হয়ে উঠলো। রাশিয়ায় অনেক মেয়ের নাম রাখা হলো ইন্দিরা। অতএব বুঝেছো মিত্তির! রাশিয়ানরা ইন্দিরাজীকে চোখের আড়াল করতে পারবে না—তাই তার মূর্তি বানিয়ে ফেললো।'

এমন সময় পটলাদা ঢুকলেন বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে। 'ওরে সন্তে, একটা ভাল ডাবল হাফ চা দে বাবা। রবিবারের বাজারে যা ভীড়, একেবারে দম শেষ হয়ে গেছে।'

পটলাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো মিত্তিরদার পাশে।

মিত্তিরদা শুরু করলো, 'কি পটলাদা, কি বাজার করলেন?' 'আর বল কেন মিত্তির। তুমি আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়ে বেশ আড্ডা মেরে কাটাচ্ছো, আর আমি সর্বসাকুল্যে আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। এই একটু মাংস কিনলাম, আজ রবিবার বলে। আমাদের মত লোকদের প্রোটিন খাদ্য বলতে তো দুপিস্, বড় জোর তিন পিস্ মাংস সপ্তাহে একবার, আর সপ্তাহে দুদিন একপিস করে মাছ।' পটলাদা কথাগুলো বলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে 'আঃ!' বলে আওয়াজ তুলে সন্তের চায়ের তারিফ জানালো।

মিত্তিরদা বলে উঠলেন, 'যাই বলো পটলাদা তুমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ধার না ধেরে আটটি ছেলে-মেয়েকে কষ্ট করেই মানুষ করছো। ইতিমধ্যে তোমার বড় ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে দুর্গাপুর স্টীল ফ্যাক্টরীতে ভালো চাকরী করছে। মেজ ছেলে চাটার্ড-এ্যাকাউনটেন্ট হয়ে আই. সি. আই. এ. ঢুকে গেছে। বাকি সবাই পড়াশুনা করছে ভালই। আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই ইনটেলিজেন্সিয়ার উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। অতএব এখনকার নব্য বাবা মারা একটি বা নিদেন পক্ষে দুটি, তাও আবার প্রথম যদি মেয়ে হয় তবে একেবারেই ইতি করে। যদি পরেরটি আবার মেয়ে হয় এই ভয়েই একটি মেয়ে নিয়েই আনন্দে তাকে কে. জি. স্কুলে পড়াচ্ছে, নাচ শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে। বড় হয়ে তাকে ডাক্তার করবে বা ইঞ্জিনীয়ার করবে তাই নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা স্বামী-স্ত্রীতে।

একটি ছেলে বা একটি মেয়ে যদি দৈব দুর্বিপাকে মরে যায় তখন তো আর কেঁদে কূল পাওয়া যাবে না। আর একটি কথা, মধ্যবিত্ত ঘরে যদি ছেলে-মেয়ে কমে যায় তবে সমাজে ইনটেলিজেন্সিয়ার অভাব দেখা দেবে।

হঠাৎ ভাড়া আদায়ের বিল বই হাতে নিয়ে নিতাইদা এসে হাজির। নিতাই বাড়ুজ্যে রসিক লোক। বাবার অগাধ সম্পত্তি পেয়ে জীবনে কোনদিন কিছু করলেন না। সকালে ভাড়া আদায়, দুপুরে কোর্ট আর রেন্ট কন্ট্রোলার অফিস, আর সন্ধ্যে হতে না হতেই 'দিনের শেষে' ক্লাব ঘরে তাসের আড্ডা। বেড়ে আছেন আমাদের নিতাইদা।

নিতাইদা এবার হেসে মুখ খুললেন 'কাল রাত্রে নাইট প্রোগ্রামে টি. ভি-তে একটা জাপানী বই দেখালো। দেখেছ নাকি কেউ? মরতে অনিচ্ছুক লোক-গুলোকে কি রকম ভাবে হারিকিরি করে মরতে বাধ্য করছে। এটা একটা নৃশংস মরণ, ধারাল ছুরিটাকে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ফালা-ফালা করে চিরে ফেলে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়া। বাবা! ভাবতেই শিহরণ জাগে।'

মিত্তিরদা জলদি নিতাইদার কথার ক্যাচ ধরে বলে উঠলেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', সভ্য মানুষেরাই সবচেয়ে বেশী অসভ্য। মুখে শান্তির বাণী, হিউম্যান রাইট্স রক্ষার শপথ আর ভেতরে ভেতরে কে কতো তার ঘরে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা।

পটলাদা এবার হুংকার ছেড়ে বলে উঠলেন, 'হিংসাই সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ। এই দেখোনা আমি আজ মাংস কিনেছি রবিবারে একটু ভাল খাব বলে। কিন্তু এর পেছনে যে একটা জীব ধরফড় করে মরে গেল তার কথা তো আমরা খাবার সময় মনে করি না। তবে আর একটা কথা—ভগবানও এক এক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে তার সৃষ্ট মানুষদের ও পশুদের হত্যা করে। এক একটা সাইক্লোনে, দুর্ভিক্ষ বা ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক মারা যায়। এটাও তো ভগবানের একটা হিংসার প্রতিচ্ছবি। আসল কথা—ইউ আর টু মেক রুম ফর আদার্স। কেউ কি আর এই পৃথিবী নামক মামার বাড়ির আবদার ছেড়ে যেতে চায়? অতএব মেরে তাড়াও।'

মিত্তিরদা খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লেখা রেলওয়ে বুকিংয়ে কমপিউটার সিসটেম চালুর কথাটা জোর করে পড়ে সকলকে শোনাতে লাগলেন। শান্তিদা এটা শুনে বলে উঠলেন, 'এবারে তাহলে অনেকের চাকরি যাবে। রিজারভেশন

কাউন্টারের অনেক করণিককেই কাঁদতে হবে।

মিত্তিরদা বলে উঠলেন, 'তা কেন? ওনাদের রেলের অন্য কাজে লাগানো হবে।'

শান্তিদা উত্তর দিলেন, 'মডার্ণ টেকনলজির উদ্ভাবনে কম লোক দিয়ে বেশী কাজ করান যায়। কিন্তু যে দেশে এত বেকার সে দেশে দিতে হবে ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট। তাই আমার মতে আধুনিক প্রযুক্তি এ দেশে অচল। এটা চালু করলে আমাদের দেশে বেকার বাড়বে। এটা একটা অটোমেশিন ছাড়া কিছু নয়।'

মিত্তিরদা প্রতিবাদ করলেন, 'মানুষ যত সভ্য হবে ততই এগুলিকে মেনে নিতে হবে। একটা ব্যাপারে যেমন কাজের জন্যে লোক কম লাগবে তখন সন্ধান করতে হবে অন্য কাজের। এই দেখো না পাতাল রেল আবার রেল বিভাগের একটা নতুন সংযোজন। যখন পুরোপুরিভাবে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন ওখানেই কত লোকের দরকার হবে।'

নিতাইদা এই আলোচনার হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, 'ইরাণ আবার ইরাকের অয়েল টাংকারে বোম মেরেছে। এই দুদেশের যুদ্ধ আর মিটবে না। আর এই জন্যে আমাদের খেজুর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আগে খেজুর ছিল ছ'টাকা কিলো আর এখন কুড়ি টাকা!'

শান্তিদা ঝেঁজে বলে উঠলেন, 'আরো বাবা খেজুর না খেলেও চলবে কিন্তু এটোমিক্ ওয়ার বা স্টার ওয়ার হলে বাঁচবে কি না তা আগে ভাবো। পৃথিবীতে যত অশান্তি তার জন্য কে. জি. বি. আর সি. আই. এ. দায়ী। পৃথিবীর দুই শক্তিধরের এই দুই সিক্রেট এজেন্সির অপকর্মের ফলে এই অশান্তি। হঠাৎ পটলাদার ছেলে ভোম্বল দোকানে এসে হাজির : 'দশটা বেজে গেছে মা বাড়িতে খুব ঝামেলা করছে। মাংস কখন রান্না হবে। তুমি এখানে বসে গল্প করছো। চল তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো।' অতএব চার সদস্যের পার্লামেন্টের রবিবারের প্রাতঃকালীন অধিবেশন শেষ। পরের অধিবেশন শুরু হবে পরের রবিবার সকালে।

হরি ওম্ তৎসৎ

রবিবারের বাজার করতে গিয়ে বহুবছর বাদে আমার বিশিষ্ট বাল্যবন্ধু ভজহরি ভট্টাচার্জির সংগে দেখা হয়ে গেল। ভজহরিকে আমরা ছোট করে হরি বলেই ডাকতাম। আমি হরিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এতদিন কোথায় ছিলি?' হরি বললো, 'আমি এখন মথুরাতে থাকি, মথুরা স্টেশনের এখন আমি এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার।'

হরি চাকরির প্রথমদিকে হাওড়া স্টেশনে লাইন ক্লিয়ার সেক্শনে কাজ করতো। ওর কাজ ছিলো—হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত যত সুবারবন ট্রেন যাতায়াত করে তাদের গার্ড এবং ইঞ্জিন ড্রাইভারকে একটা সাবধান রিপোর্ট দেওয়া। কোথায় লাইন খারাপ আছে এবং সেইজন্য ট্রেনকে খুব আস্তে আস্তে যেতে হবে, কোথায় ইলেকট্রিক ওভারহেড লাইন বিগড়ে আছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সাবধান রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোন ট্রেন হাওড়া স্টেশন ছাড়তে পারবে না। হরি খুব আস্তে আস্তে লিখতো এবং সেইজন্য ঠিক সময়ে রিপোর্ট ড্রাইভার এবং গার্ডের হাতে পেঁছিতো না এসং যথারীতি ট্রেন লেটে ছাড়তো। একবার ট্রেন লেটে ছাড়ার জন্য ডেলি প্যাসেঞ্জাররা হাওড়া স্টেশনের ডেপুটি স্টেশন মাস্টারকে ঘেরাও করেছিল। এই কারণে ঐ সাবধান রিপোর্টের লেখক আমাদের বন্ধুবর হরি চার্জশীট হাতে পেলো। চাকরী রাখা মুশকিল। হরি অনেক কষ্টে মথুরার এক বাঙালী এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের সংগে মিউচুয়াল করে মথুরাবাসী হয়ে গেলো।

হরির বাড়ীর সবাই খুবই হরি ভক্ত। হরি সমেত পরিবারের বয়স্ক সকলেই নিরামিষ খেত, তিলক সেবা করতো এবং কণ্ঠি ধারণ করতো। হরির বাবা মারা যাবার পর হরি ওর মাকে ও নিজের পরিবারের সকলকে মথুরাতে নিয়ে গিয়ে রাখলো। ছুটির দিনগুলোতে ওরা প্রায়ই বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করে পরিতৃপ্ত হোত।

স্কুলে যখন আমরা পড়তাম হরির তখন হাতের লেখা খুব খারাপ ছিলো।

ক্লাস এইটে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার বাংলা খাতা দেখছিলেন আমাদের স্যার অবনীবাবু। আমাদের সকলকে খাতা দিয়ে স্যার আমাদের ভাল করে পড়ে দেখতে বললেন। কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে তা স্যার মার্ক করে দিয়েছেন এবং আমরা তা দেখে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিলাম। হরিকে এতক্ষণ স্যার খাতা দেননি। হরি তো চিৎকার শুরু করেছে, 'স্যার আমার খাতা কোথায় গেল। আমি এখনও পাইনি।' স্যার গম্ভীরভাবে ওর খাতাখানা ওনার ব্যাগের ভেতর থেকে বার করে উঁচু করে খাতা খুলে সবাইকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবা হরি, স্যার কি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার? একি হাতের লেখা না রাস্তার জঞ্জাল বাবা?'

হরি ছাত্র হিসাবে খুব ভাল ছিলো না। ওর পক্ষে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করা খুব দুরূহ ছিলো। আমাদের সায়েন্স টিচার ধীরেনবাবু হরিকে একদিন ক্লাসে পড়া না পারায় কৌতুক করে বললেন, 'হরি, তুই যদি কোনদিন ম্যাট্রিক পাস করিস তবে আমার হাতের তেলোয় চুল গজাবে।' অবশেষে একদিন হরি থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আমাদের বললো, 'জানিস তো, ধীরেনবাবুকে একবার ওনার হাতের তেলোটা দেখবার জন্য বলবো ভাবছি। আমি তো পাশ করে গেছি, দেখা যাক ওনার হাতের তেলোয় চুল গজালো কিনা।'

আমি ডাক্তারী পাশ করার পর হরি একদিন আমার চেম্বারে এসে বললো, 'আচ্ছা ডাক্তারী পড়তে মাসে কত করে খরচ হয়রে?' আমি বললাম, 'কেন তোর ছেলে কত বড় হয়েছে যে এখন থেকে এসব খোঁজ নিচ্ছিস? হরি বললো, 'ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবার ইচ্ছে আছে। যদিও ছেলে এখনও হয়নি। আসছে মাসে হবে।' মনে মনে আমার ভীষণ হাসি পেলো, কিন্তু হাসি চেপে রেখে হরিকে ডাক্তারী পড়তে মাসিক কত খরচ পড়বে তার মোটামুটি একটা হিসাব দিলাম। হরি শুনে খুব খুশী।

হরি ছিলো খুব মাতৃভক্ত। হরি কোনদিন ওর নাকের চুল কাটতো না, তাই নাকের চুলগুলো হাতীর শুঁড়ের মত দুনাক দিয়ে বেরিয়ে থাকতো। আমি একদিন ওকে বললাম, 'হরি তোর নাকের চুল কাটিসনি কেন?' হরি বললো, 'মা কাটতে বারণ করেছে।'

হরির চেহারাটা বিপুল এবং আহারও ছিলো তদ্রূপ অধিক। একবার আমাদের স্কুলের সরস্বতী পুজোতে ও বড় গামলার অর্ধেক বোঁদে খেয়ে ফেলে-

ছিলো, সে কথা আজও আমরা ভুলিনি।

এই গতবছর পয়লা এপ্রিল বাজার যাবার পথে সকালে আমি হরির বাড়ি গেলাম। হরি তখন বাড়ি নেই। আমি ওর মেয়েকে বললাম, 'তোমার বাবা বাড়ী ফিরে এলে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিও। আমাদের ছোটবেলার প্রাইভেট শিক্ষক মাখনবাবু আমাদের বাড়িতে বসে আছেন।' একটু বলে রাখি—এই মাখনবাবু আমায় এবং হরিকে বাড়িতে পড়াতেন। আমরা সকলেই ওকে ভালবাসতাম।

ইতিমধ্যে হরি আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা মাসীমা, মাখনবাবু কোথায়? নীলরতন যে আমাদের বাড়িতে বলে এলো মাখনবাবু আপনাদের বাড়িতে বসে আছেন।

মা প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিলেন, কারণ সকাল থেকে আমাদের বাড়িতে বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কেউই আসেনি। পরে মা বুঝতে পেরে হরিকে বলেছিলেন, 'মাখনবাবুতো আসেননি, তাহলে নীলরতন তোমাকে এপ্রিলফুল করেছে।'

আমাদের ক্লাসে নীলকণ্ঠ বলে এক বন্ধু পড়তো। সে ছিলো লম্বা এবং খুব রোগা। এই রোগা পটকা নীলকণ্ঠ হরির সংগে ঝগড়া করে বিপুলাকার হরিকে দমাদম ঘুঁসি মারতে লাগল। হরি কোন শারীরিক প্রতিবাদ না করে মার খেয়ে যেতে লাগলোঃ 'এই দ্যাখনা তোরা, নীলকন্ঠ আমায় মারছে'। অথচ হরি যদি নীলকন্ঠকে একটা ওর ভারী হাতের ঘুঁষি মারতো তাহলে নীলকন্ঠ হয়তো ছিটকে পড়তো। হরির ভাবটা যেন সেই 'মেরেছিস কলসির কানা, তাবলে কি প্রেম দেবনা?' ইতিমধ্যে হেডমাস্টার মশায় ক্লাসে ঢুকে পড়েছেন, সবাই তখন চুপচাপ। হরি কেঁদে চলেছে। হেডমাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হরি তুমি কাঁদছো কেন?' হরি বললো, 'নীলকন্ঠ আমায় মেরেছে।' হেডস্যার হেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোনভাবে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন 'বাবা হরি, তুমি মার খেয়ে গেলে এই বিরাট বপুটা নিয়ে। তুমি ঐ লিকলিকে ছেলেটাকে মেরে ঠান্ডা করতে পারলে না। সত্যিই তুমি হরি। প্রেমের সাগর। হরি ওম তৎ সৎ।'

মন না মতিভ্রম

বিমলের বিয়ে খুব ধুমধাম করে হয়ে গেল। আজ বউভাত। অজয় বিশ্বাস মশায় ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়েছেন এবং বিমল এখন ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টে মোটা মাইনের চাকরি করছে। বিমলের বউ অঞ্জনা খুব সুন্দরী, এম এ পাশ। খুব জাঁকজমকে বউভাতও সুসম্পন্ন। প্রশস্ত ঘরে ওয়ালনাট কালারের ডবল বেড্ খাটে চার ইঞ্চি ডানলোপিলো গদির উপর চকমকে রাজস্থানী বেড-কভার খানা চমৎকার মানিয়েছে। রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে গোটা ঘর ভরপুর। বউ ভাতের রাত, একটা নাগাদ ঐ ঘরে খিল পড়লো।

খুব স্বাভাবিক কারণে নবদম্পতির সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো। অঞ্জনা বললো—'দেখো আমার ডান হাতটা কি হয়ে গেছে।' বিমল দেখলো অঞ্জনার হাতটা ওপর দিকে উঠে আছে। বিমল বললো—'তুমি হাতটা নিচে নামাও দেখি কি হলো।'

অঞ্জনা চিৎকার করে উঠলো—'ছেড়ে দাও, আমার দারুণ লাগছে।' অঞ্জনা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথ রুমে ঢুকলো।

বিমল অসহায় হয়ে মাকে বললো ঘটনাটা। মা বিপদ বুঝে বাড়ির সকলকে বললো খবরটা। বিমল ডাঃ সেনকে ডাকতে বেরিয়ে পড়লো। রাঁধুনী মাসীমা এ খবর শুনে কাজের মেয়েটিকে বললো—'কি লজ্জা, কি লজ্জা।'

বাথরুম থেকে বেরুলে বিমলের বোন রুমা নতুন বৌদিকে জামা কাপড় বদলাতে সাহায্য করতে করতে বললো—'বৌদি, ফুলশয্যার রাতের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু বর ভালবেসে বৌয়ের হাত ভেঙ্গে দেয় এ কথা কিন্তু কোনদিন শুনিনি।'

ইতিমধ্যে ডাঃ সেন এসে হাজির। আত্মীয় কুটুম্বরা একে একে বৌমাকে দেখতে ঘরে ঢুকছে। এই অবস্থায় অঞ্জনার অবস্থা বড়ই করুণ।

ডাঃ সেন পরীক্ষা করে বললেন—'না বৌমা, তোমার হাতের হাড় ভাঙ্গেনি বা

সরেও যায়নি। একটু খেচকা লেগেছে। তা ঠিক হয়ে যাবে। তুমি হাতটা নীচে নামাও কিছু লাগবেনা।'

অঞ্জনা অধীর কন্ঠে বললো, 'না ডাক্তারবাবু আমি হাত নামাতে পারব না।' ডাঃ সেন অগত্যা একটা এক্সরে করার উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন হাতের এক্সরে করান হলে দেখা গেল, হাতের হাড়ের কোন ফ্যাকচার বা ডিসলোকেশন নেই। কিন্তু অঞ্জনার পক্ষে নীচের দিকে হাত নামানো ও সম্ভব নয়। তার কেবলই মনে হচ্ছে, হাত নামলেই তার ভীষণ লাগবে।

ডাঃ সেন বললেন—'একটা মনের বাতিক। বৌমাকে একজন মানসিক ডাক্তার দেখান দরকার। বেশীদিন এইভাবে থাকলে ফ্রোজেন সোলডার, মানে হাতের গ্রন্থি জমে গিয়ে বরাবরের জন্য বিকলাংগতা দেখা দেবে।'

বিমলের বাবা মানে শ্বশুর মশায় ডাঃ সেনের উপদেশ মত মানসিক চিকিৎসা বিশারদ ডাঃ উপাধ্যায় মশায়কে দেখাবার বন্দোবস্ত করলেন।

ডাঃ উপাধ্যায় একদিন বিমলদের বাড়িতে এলেন। অঞ্জনা উর্ধ্বাহু হয়ে সোফায় বসলো। ডাঃ উপাধ্যায় আগে ভাগে ডাঃ সেনের কাছে কেস হিস্ট্রি জেনে নিয়েছিলেন। পরীক্ষা করবার জন্যে ডাঃ উপাধ্যায় অঞ্জনার কাছে গেলেন এবং হঠাৎ অঞ্জনার বুকের কাপড়টা টেনে খুলে দিলেন। স্বাভাবিক লজ্জা নিবারণের জন্য সে তার দু হাত দিয়ে বুক ঢাকলো এবং সেই উর্ধ্বাহু নেমে এসে অঞ্জনার বক্ষ আবরণীতে পরিণত হল। ডাঃ উপাধ্যায়ের এই আচরণে প্রথমটা সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেও সকলের বুঝতে দেরী হলনা যে অঞ্জনার হাত স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ডাঃ উপাধ্যায় তার এই অভদ্র চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নিলেন।

অঞ্জনাও খুব খুশী, তার হাত আর ব্যথা করছে না। অঞ্জনা সব গুরুজনদের প্রণাম করলো তার এই রোগ মুক্তির জন্যে। বিমলের মা অঞ্জনার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে বলে উঠলেন—'মন না মতিভ্রম।'

ত্রয়ী

প্রত্যেক বছরের মত এবারেও উনিশশো ছাপান্ন সালের ব্যাচমেট রি-ইউ-রিয়নের ভেন্যু ঠিক হয়েছে সল্টলেকে প্রাণতোষের বাড়িতে। ডাঃ প্রাণতোষ মজুমদার খুব সফল মানুষ। লিভারপুলে রয়্যাল অর্থোপিডিক হসপিটালে পনের বছর কনসালটেন্টের কাজ করে ছেলে মেয়েকে ভারতীয় স্টাইলে মানুষ করবে বলে ওদেশ থেকে ফিরে এসেছে।

কলকাতার বুকে ব্যাচমেটদের মধ্যে জনাকুড়ির বেশী কাউকে যোগযোগ করা গেল না। তাও আবার আর. এস. ভি. পি লেখা কার্ডের উত্তরে চিঠিতে বা টেলিফোনে জনা আষ্টেক মেম্বার আসতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

আয়োজনের ত্রুটি নেই। বেশীর ভাগই সস্ত্রীক, আবার কেউ কেউ ছেলে বা মেয়েকেও এনেছে।

চললো হুল্লোড় সকাল নয়টা থেকে। ব্রেকফাস্ট সেরে স্পাউশরা মানে বৌ বাচ্ছারা চার পাঁচ খানা গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। ঝিলমিল, বিধান শিশু উদ্যান আরও কি কি সব দেখা ওদের প্ল্যান।

আমরা চারজন 'পেরানের বন্ধু' বাড়ী সংলগ্ন লনে একটা আমগাছের ছায়ায় বসে চারটে চেয়ার নিয়ে বসলাম।

আমিই প্রথম শুরু করলাম, 'এই দ্যাখ, আমি মাঝে মাঝে একটু আধটু সাহিত্য করি। এবারে পুজা সংখ্যায় কোন একটা ছোটখাটো পত্রিকায় লেখা পাঠাবো। আমার এক ক্লায়েন্ট হচ্ছেন ওইরকম এক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি খুব জোর তাগিদ দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি লেখা দেবার জন্যে। এবারে আমি ঠিক করেছি আমরা আমাদের প্রফেশনে যে সমস্ত নারীকে মিট্ করেছি তাদের সম্বন্ধে কিছু লিখবো।"

রমেন মানে ডাঃ রমেন দত্ত হেসে বলে উঠলো, 'তুই শালা আবার এসব কবে থেকে শুরু করলি ?"

আমি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, 'রমেন, তুই তো এখন কোলকাতার একজন নামী গাইনোলজিস্ট। তোর ক্লায়েন্ট তো সবাই নারী। কিছু নোটেবল নারীর কথা তু-ই-ই বল না।'

'দাঁড়া ভেবে বলছি। হাঁ পেয়েছি। কোন ফিল্মস্টার হলে চলবে?' রমেন জিজ্ঞেস করলো।

আমি বলে উঠলাম, 'ফাস্ট ক্লাশ হবে। বল বল।'

রমেন বলতে শুরু করলো, 'দ্যাখ, নাম করা যাবে না তার কারণ আমি যার কথা বলবো তিনি এখন বাংলা সিনেমার আকাশে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।'

—'ঠিক আছে নাম না করে বল।' আমি আমার নোটবুক আর পেনটা বার করতে করতে বললুম।

রমেন শুরু করলোঃ আমি একদিন চেম্বারে বসে আছি হঠাৎ একটা টেলিফোনে প্রমীলা কণ্ঠ। 'আমি একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। চেম্বার আওয়ারের বাইরে সময় দেবেন। জানেন তো ফিল্মস্টারদের লোকে দেখলেই ভীড় করে ছেঁকে ধরে।'

'ঠিক আছে আপনি কাল দুপুর দুটোর সময় আসুন। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরেই আপনাকে দেখবো। তখন চেম্বারে অন্য কোন রোগী থাকবে না।'

পরদিন ঠিক দুটোর সময় ভদ্রমহিলা এসে হাজির। আমার কনসালটেসন রুমে বসে আমায় বল্লেন, 'আই অ্যাম গোইং টু হ্যাভ এ বেবি। খুবই মরনিং সিকনেস হচ্ছে। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ বোস আমায় দেখাশোনা করছেন। উনি আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।'

আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, সি ইস ক্যারিং ফর থ্রী মানথস।

ভদ্রমহিলা শুনে খুব খুশি। উনি আমায় বললেন, 'দিস ইজ মাই ভেরি কস্টলি বেবি। আপনার পরামর্শ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমি সুস্থ ও সবল একটি শিশুর মা হতে চাই।'

আমি আশ্বাস দিলাম, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপাততঃ আপনার সব কিছুই ঠিক আছে। প্রত্যেক মাসে একবার করে চেক আপে আসবেন।'

এর পরের ঘটনা খুব সাংঘাতিক। পরের দিন আমার চেম্বার আওয়ারে একটা টেলিফোন এলো 'আমি মি এক্স বলছি। আমার স্ত্রী মিসেস ওয়াই আপনার কাছে গত কাল গিয়েছিলেন। আমি চাইনা বাচ্চাটা এই পৃথিবীতে আসুক।

আমার মনে হচ্ছে এই সন্তান আমার নয়। আপনি কাইন্ডলি ওটাকে এ্যাবর্ট করার ব্যবস্থা করুন।'

যিনি টেলিফোন করলেন মানে ঐ ভদ্র মহিলার স্বামী, তিনি একজন খ্যাতনামা নায়ক। আমি ঐ খ্যাতনামা নায়ককে উত্তর দিলাম, 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে যদি সম্মতি দেন তবেই আমি এই প্রেগ্‌নেন্সি টারমিনেট করবো, নচেৎ নয়।'

শেষ অবধি উভয়ের সম্মতি পাওয়ার অভাবে আমি যথা সময়ে একটি সুস্থ সবল পুত্র সন্তান উপহার দিলাম ভদ্রমহিলাকে।

এই ঘটনার ঠিক চৌদ্দ দিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম ওই খ্যাতনামা অভিনেতার মৃত্যু সংবাদ। মৃত্যুর কারণ খুদখুশি, আত্মহত্যা, সুইসাইড।

আমি নোটবুকে ঘটনাটা টুকতে টুকতে বলতে লাগলাম, 'এটা বডড্ এ মার্কা হয়ে গেল রে।' রমেন এর পরে বলে উঠলো: আরে এতো কি এবারে একটা এক্স মার্কা গল্প শোন। বলে রাখি ব্রিটিশ সেন্সর বোর্ড সুপার এডাল্ট ছবিকে দেয় এক্স সারটিফিকেট।

আমাদের সংগে লিভারপুলে একজন গুজরাটি ডাক্তার আমাদের ইউনিটে কাজ করতো। তার বিলেতে চলে আসার ইতিহাস একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। ওই ডাক্তার সাহেব হাউস সার্জেনশিপ শেষ করার পরে আমেদাবাদের এক নার্সিংহোমে এক অবিবাহিত মেয়ের এ্যাবরশন করিয়েছিলো। এর পর বছর খানেক বাদে ওর নিজের বিয়ের কথা হয়। এদের ফ্যামিলি খুব কনজারভেটিভ। বাবা মা পছন্দ করে বিয়ে স্থির করেছেন। ছেলেকে বিয়ের আগে মেয়েকে দেখবার রীতি ওদের পরিবারের কখনও পালিত হয়নি। অতএব ওই ডাক্তার সাহেব মেয়েকে একেবারে সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে ছাঁদনা তলায়।

শুভদৃষ্টি থেকেই শুরু হোলো গন্ডগোলের। কেবলই মনে হচ্ছে ওই মেয়েটিকে যেন কোথায় দেখেছে ওই গুজরাটি ভিষক মশায়। দু'এক দিনের নিভৃত চিন্তায় ও বুঝতে পারলো ও নিজের হাতে ওই মেয়েটির, অধুনা ওর স্ত্রীর, অবিবাহিত অবস্থার সন্তানের ভ্রূণকে ডাইলেটেশন এন্ড কিউরেটাজ করে হত্যা করেছে। এর পর আমার গুজরাটি কলিগটি আর বেশী দেরী না করে পাশপোর্ট এবং জব ভাউচার যোগাড় করে চলে এলো সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। এদেশে ও এখন কেবলই ইংরেজ মেয়েদের সংগে ডেটিং করে বেড়াচেছ

কিন্তু বিয়ে নামক বস্তুটি সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে। এর কারণ বোধ হয় একটিই, তা হচ্ছে ওকে একজন নারী ঠকিয়েছে অতএব সেই আক্রোশে সব নারীকেই শুধু খেলাবে কিন্তু আসল জায়গায় ফাঁকি দেবে।

আমি আমার নোটবুকটা এবং কলমটা পকেটে পুরে দিলাম আর বললাম, 'রমেন, এমন দুর্গন্ধ ছাড়ালি যে এখানে আর বসে থাকা যাচ্ছে না। চল একটি জায়গা বদল করি।' এই পরে আমরা ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম। প্রাণতোষের স্ত্রী আমাদের সকলের জন্যে কফি নিয়ে হাজির ঃ 'আপনারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি কফি খাবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আমরা নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বললাম, 'এই একটু লনে বসে ছিলাম।'

কফি পর্ব শেষে আমাদের চার বন্ধু ছাড়া সবাই ভ্যানিস হয়ে গেল। আমাদের ব্যাচমেট অলক, হাঁ ডাঃ অলক ঘোষ শুরু করলো, 'জানিস আমার দার্জিলিং হাসপাতালে পোস্টিং-এর সময়কার একটা ঘটনা আমার মনে খুব দাগ কেটেছে।'

আমি সংগে সংগে আমার নোটবুক আর কলমটা বার করে ফেললাম।

অলক আরম্ভ করলো : একদিন চেম্বারে বসে আছি। রোগীপত্র নেই, হঠাৎ চেম্বারে জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম একটা লাল রংয়ের টোয়োটা গাড়ী আমার বাড়ীর সামনে থামলো। গাড়ীর ভেতর থেকে নামলো এক বোমু পরা সিকিমী ভদ্রমহিলা। কোলে তার একটি সাত আট মাসের ছেলে। চেম্বারে ঢুকে আমাকে সম্ভাষণ জানালো 'গুড আফটারনুন ডক' বলে।

আমি ওকে বসতে বললাম। উনি অকসোডিয়ান উচ্চারণে ইংরিজিতে আমায় বললেন, 'আমার ছেলের কানে ব্যথা এবং পুঁজ পড়ছে। আপনি দয়া করে দেখুন।'

আমি কান দেখতে শুরু করলে বাচছাটি কাঁদতে শুরু করলো। বাচ্ছার কান্না থামাতে ওই সিকিমী মা ওনার বুকের বমুর কিছু অংশ সরিয়ে উন্ধত স্তনটির অগ্রভাগ শিশুর মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন। বাচ্চাও চুপ। আমার পরীক্ষা করার সুবিধে হলো।

আমি তীর্যক নয়নে লক্ষ্য করলাম ওনার বমুর মধ্যে কোন অন্তর্বাস নেই। ভদ্রমহিলা লম্বা। রং দুধে আলতা ফেটালে যা হয় তাই। কোথাও কোন

অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। নাক মুখ যেন ছেঁনিতে মনের মত করে কাটা। ভদ্র-মহিলার বক্ষ দুগ্ধ সেবন করানর পোজটা আমাকে মনে করিয়ে দিলো মাদার মেরি যেন যীশুকে দুধ দিচেছন। আমি শিশুটির ব্যবস্থা পত্র দিলাম। ভদ্রমহিলা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাউমাচ আই ও ইউ'।

আমি আমার পারিশ্রমিকের পরিণাম বললাম। উনি ওনার সুন্দর ইম-পোর্টেড হ্যান্ড ব্যাগ থেকে আমার ফি দিয়ে 'বাই ডক' বলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওর অপূর্ব চলনভঙ্গি লক্ষ্য করলাম। তিনি আর লাল টয়োটাতে শিশুটিকে নিয়ে উঠলেন। তারপর ভোঁ করে গাড়ীটি বেরিয়ে গেল। আমি যেন কেমন মোহাচছন্ন হয়ে গেছিলাম। মনে হতে লাগলো যেন জীবন্ত ভেনাস আমার চেম্বারে হাজির হয়েছিলো আর এক্ষুণি হুস করে যেন আকাশে মিলিয়ে গেল।

ঘড়িতে দেখি একটা বাজে। বাড়ীর বাইরে দেখি আমাদের স্পাউসেরা সবাই সাইট সিয়িং সেরে ফিরেছে।

খাবার টেবিল সাজানো। সকলে উদর পূর্তি'র পর্বে মেতে গোলো।

ঐ গেটটুগেদার আমার মনে থলিতে ঐ তিন নারীর ঘটনা ভরে নিয়ে সে দিনের মত সকলকে বিদায় জানিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

জঞ্জাল

বঙ্গবাসী সিনেমায় একটা মারপিটের হিন্দী বই এসেছে। প্রচন্ড ভীড় হচ্ছে। অনেকে বললো বইটা ভালো। চলে গেলাম একাই বইটা দেখবো বলে। আমার এই বিকৃত রুচির জন্য আমার স্ত্রী আমার প্রচন্ড সমালোচনা করতেন তবুও তিনি আমাকে মার্জিত অভ্যেসের বশবর্তী করতে পারলেন না।

হাউস ফুল, চারিদিকে পাঁচ সাতজন টিকিট ব্ল্যাক করছে। আরে, ঐতো আমাদের পাড়ার ছেলে পোল্টে। 'তিনকা পাঁচ' বলে চেঁচাচ্ছে। আমি গুটি গুটি করে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং একটা জমাট বাঁধা ভিড়ের মধ্যে কোন ভাবে ঢুকে বললাম 'পোল্টে, আমাকে একখানা টিকিট দেতো।'
পোল্টে আমাকে দেখে যেন ভূত দেখলো। সলজ্জভাবে আমাকে একখানা টিকিট দিলো। আমি পয়সা দিতে গেলে ও বলে উঠলো 'আমি আপনার কাছে পয়সা পরে নেবো।' আমি পাঁচ টাকার একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি হলে ঢুকে পড়লাম।

সিনেমা থেকে ফিরে বাড়িতে ঘটনাটা বললাম। সব শুনে মা বললেন, 'আহা। ছেলেটা কি হয়ে গেল। পোল্টে তখন চারদিনের মাত্র। ওর মা আঁতুড়ে, ওর বাবা মিল থেকে কাজ করে ফিরছে এমন সময় প্রাণ হারালো একটি চলন্ত লরির তলায়। সেই থেকে পোল্টের মা লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে ওকে বড় করল। আর সেই হতভাগীও গতবছর কলেরাতে প্রাণ হারালো।'

বড় হয়ে ও কিছুদিন সাইকেল রিক্সা চালাতে লাগলো। আমাদের পাড়ার একজনদের রকে শুতো আর হোটেলে খেতো।

আমাদের পৌরসভার নির্বাচন হবে। চারিদিকে খুব তোড়জোড় চলছে। দেখি পোল্টে আমাদের পাড়ার মোড়ে পোস্টার মারছে। আমাকে দেখে নমস্কার করলো এবং বলতে লাগলো, 'ডাক্তার বাবু আমাদের দলকে একটু দেখবেন। মিউনিসিপ্যালিটির মেথরদের ধর্মঘট হলে আমরা কিন্তু নিজেরা পায়খানা

পরিষ্কার করবো, জঞ্জাল সাফ করবো, নর্দমা পরিষ্কার করবো।' আমি বললাম 'আচ্ছা দেখবো ভাই।' ভোটের দিন বিকেল তিনটে নাগাদ চারিদিকে বোম ফাটার আওয়াজ হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমাদের পাড়ার গলিতে পোল্টে অনেকগুলো ছেলের সংগে দৌড়চ্ছে আর বলতে বলতে যাচ্ছে, 'দরজা জানালা বন্ধ করুন। ৪নং বুথে গোলমাল হচ্ছে।' সন্ধ্যের সময় শুনলাম পোল্টে ও ওর দলের কিছু ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ওরা নাকি বোমবাজি করেছে। দিন তিনেক বাদে দেখি পোল্টে পাড়ায় ঘুরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'হ্যারে সেদিন কি হয়েছিলো?'

উত্তরে পোল্টে বললো, 'বাল্টু ঘোষের ছেলেরা জাল ভোট দিতে এসেছিল। আমরা ওদের তড়পে দিয়েছি।'

পাগলা সনাতন উকিল ইদানিং পোল্টেকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই সনাতন বাবু ছিলেন এককালে সদর আদালতের ক্রিমিনাল সাইডের উকিল আজ উনি পাগলা উকিল বলে পরিচিত।

সনাতন বাবু খুব উল্টো পাল্টা কথা বলতেন। একদিন আমি ছুটির দিনে আমাদের রকে বসে আছি। সনাতন বাবু বোধ হয় কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন—'কি ভায়া, রাস্তায় কি জঞ্জাল হয়েছে দেখেছো?'

আমি বললাম 'হ্যাঁ দেখেছি।'

সনাতন বাবু আবার শুরু করলেন 'তবে যাই বলো ভায়া, এই জঞ্জালও আমাদের কত কাজে লাগে। এতে যত ময়লা কাগজ থাকে তা থেকে আমাদের নতুন কাগজের মন্ড হয়, ওর মধ্যে ছিঁটে ফোঁটা খাবার যা থাকে তা আমাদের পাড়ার কুকুরদের পেট ভরায়। অপর বাকি যা থাকে তা দিয়ে পুকুর ভরাট করা হয়, আর কম্পোস্ট সারও তৈরী হয়।'

আমি সমাতন বাবুকে বললাম 'আসুন বাড়ীর ভেতর একটু চা খাবেন।

ওকে সদর ঘরে বসিয়ে চা আনতে বললাম। চা খেতে খেতে খেতে সনাতন বাবু আবার আরম্ভ করলেন, 'জানো ভায়া, আমি ইদানিং একটা রিসার্চ করছি। এই যে সব সমাজবিরোধীরা আমাদের চারিদিকে গোলমাল করে বেড়াচেছ তাদের আইনের সাহায্যে জেলে দিয়ে কোন লাভ হচেছ না। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা আবার গন্ডগোল শুরু করে। অতএব ওদের একটু ভালবাসা, একটু সহানুভূতি দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। আমার মনে হয়, মানুষ ভালবাসার কাঙাল এবং

ঐ স্নেহ দিয়ে শুভবুদ্ধির অনুভূতি জাগাতে হবে ওদের মধ্যে।'

আমার একটু কাজ থাকার জন্য আমি সনাতন বাবুকে বিদায় জানালাম।

বাংলা বন্ধের দিন গাড়ী সব বন্ধ। পাশের বাড়ির ছোকোর মায়ের প্রসব বেদনা উঠেছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কে নিয়ে যাবে এই নিয়ে সবার চিন্তা। ছোকোর বাবা রাজমিস্ত্রী, সে কয়েকদিন জগাছায় গেছে কাজের জন্যে। পাঁচ বছর বয়সের ছোকো ছাড়া বাড়ীতে বড় আর কেউ নেই। সকলে পোল্টের শরণাপন্ন হল। পোল্টের বন্ধু নিমাইয়ের রিক্স টা নিয়ে নিজেই চালিয়ে ছোকোর মাকে হাসপাতালে দিয়ে এলো।

আমাদের পাড়ার পাঁচু চক্কোত্তি হঠাৎ একদিন ডোম পাড়ার গলিতে অফিস যাবার পথে বুকের যন্ত্রণায় রাস্তায় শুয়ে পড়লেন। লোকের ভীড় জমে গেল। সবাই শুধু মুখে সহানুভূতি জানিয়ে যে যার অফিসের দেরী হয়ে যাবে বলে কেটে পড়লো। পোল্টে ওখান দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলো। সে দাঁড়িয়ে পড়ে চিন্তে পারল পাঁচুবাবুকে। সে পাঁচু বাবুর বাড়ীতে খবর দিল এবং অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঁচু বাবুকে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেল। বেচারা পাঁচুবাবুর করোনারী হয়েছিল। দুদিন বাদে তিনি মারা গেলেন।

গঙ্গাপুজোর দিন গঙ্গার ঘাটে খুব ভীড়। পোল্টে গিয়েছিলো চান করতে। পুণ্যি করতে মেয়েরা ও বুড়োরা চান করছে। হঠাৎ ষাড়াষাড়ির বান ডাকলো। 'বান আসছে, বান আসছে' বলে সকলে চেঁচাতে লাগলো। হুড়মুড় করে সকলে আড়ায় উঠে এলো কিন্তু একি! একজন কে যেন ভেসে যাচেছ। সকলে হায় হায় করছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। জলে নামতে আর কেউ সাহস করছে না। ঐ সাংঘাতিক জলের তোড়ে পোল্টে জলে ঝাঁপ দিল। ডুবন্ত একটি মেয়েকে ঘাটে তুলল পোল্টে। সকলে ভীড় করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ আমাদের পাড়ার বুড়ির মা বলে উঠল 'ওমা! এ যে আমাদের পাড়ার শেতল গো।' সবাই বলল, 'তুমি ওদের বাড়ীতে খবর দাও।'

পোল্টে সকলের কাছ থেকে পাঁচপয়সা, দশ পয়সা করে চাঁদা তুলে একটা রিক্সা ভাড়া করে শেতলকে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেল।

শেতল বেশ অনেকটা জল খেয়ে ফেলেছিলে। ডাক্তারবাবু অনেক কাণ্ড করে শেতলের জ্ঞান ফেরালেন। একদিন হাসপাতালে রেখে ছেড়ে দিলেন। পাড়ায় এ খবরটা রটে গেল। সবাই বলতে লাগলো 'পোল্টে ছিল বলেই এ যাত্রায় শেতল

রক্ষে পিল।'

শেতলের মা পোল্টের সঙ্গে দেখা করে বললো 'বাবা পোল্টে তুমি পাঁচটা টাকা রাখ, কিছু কিনে খেয়ো।'

পোল্টে বললো 'না মাসি আমি এটাকা নেবোনা। তুমি বরং পাড়ার রক্ষে কালী-পুজোতে ঐ টাকাটা শেতলের প্রাণ রক্ষার জন্য চাঁদা দিও।' শেতলের মা পোল্টেকে আশীর্বাদ করে বাড়ী ফিরে গেলো।

এই খবরটা শুনে পাগলা সনাতন উকিল বললেন, 'দ্যাখো এই পোল্টেকে পাড়ার সবাই বলে মস্তান, ও গুন্ডা ও সমাজবিরোধী। কিন্তু ওই কিনা নিজের জীবনের মায়া না করে একটি জীবন বাঁচিয়ে দিলো। আর এই কাজের দাম মাত্র পাঁচ টাকা।'

একদিন পোল্টে আমার ডাক্তারখানায় হাজির। আমি বললাম 'কি হয়েছে রে?' পোল্টে বললো 'আমার কানে ব্যথা হচ্ছে কাল থেকে।' আমি কান দেখে ওকে ওষুধপত্র দিলাম। আমার এই বদান্যতার কারণ বোধ হয় আমার মনের কোণে জমে থাকা ওর জন্য সামান্য একটু সহানুভূতি।

ওই সময় আমার আর কোন রোগী ছিলনা। আমি ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা পোল্টে, তুই পাড়ার লোকের কত উপকার করিস্ তবুও অনেকে বলে তুই নাকি গুন্ডা। তুই অনেকবার জেল খেটেছিস। আচ্ছা পোল্টে তুই একটু ভালভাবে থাক। যাতে তোর বদনাম হয় এমন কাজ তুই আর করিসনি।'

আমার এই কথা শুনে পোল্টে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো আর বলতে লাগলো : ডাক্তার বাবু, বাবা মা মারা যাবার পর ভাড়া দিতে পারিনি বলে যোগেন বাড়ীওলা আমাকে উঠিয়ে দিলো। আমি তখন ঘোষেদের রকে শুতাম তখন আমি খুব ছোট। একদিন খুব খিদে পেয়েছে। আমি রাস্তায় অনেকের কাছে পয়সা চাইলাম, কিছু কিনে খাবো বলে। কেউ পয়সা দিলোনা। সবাই বললো 'ভিক্ষে করছো কেন খোকা? কাজ করে খাও।'

খিদের জ্বালায় আমি অনন্তর তেলে ভাজার দোকান থেকে চারটে ফুলুরি আর কিছু মুড়ি চুরি করেছিলাম। চুরি করে আর খাওয়া হল না, ধরা পড়ে গেলাম। অনন্ত বুড়ো আমায় বেধড়ক মার দিলো। আর থানায় নিয়ে গেলো। এরপর আমার দশদিনের জেল হোল। জেল থেকে ফিরে এসে আমি

একদিন বাঁশতলা শ্মশানঘাটে বসে আছি। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে একটা লোক আমাকে একটা কাগজে মোড়া একটা জিনিষ দিয়ে বললো, 'এটা রাখো আমি একটু বাদে এসে নিয়ে যাবো।' আমি মোড়কটি খুলে দেখি ওতে একজোড়া কানের দুল। হঠাৎ দেখি একটা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। আমি পুলিশকে বললাম, 'একটা লোক আমার হাতে এই মোড়কটা দিয়ে গেলো।'

পুলিশটা মোড়ক খুলে কানের দুল দেখে আমাকে বেধড়ক মারতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'ওরে ব্যাটা! তুই মেয়েছেলের কান থেকে দুল ছিঁড়েছিস? এই কিছুক্ষণ আগে বাস থেকে নামতে গিয়ে একটা মেয়ের কানের দুল খোয়া গেছে। আমরা কাকেও ধরতে পারিনি।' এই বলে আমায় ধরে নিয়ে গেল। আবার আমার এক মাসের জেল হলো। আপনি বিশ্বাস করুন আমি এ কাজ করিনি। সনাতন উকিল আমায় বলেছেন যে উনি আমাকে কালী ঘোষের ধূপের কারখানায় ঢুকিয়ে দেবেন।

আমি বললাম, 'যা এখন বাড়ি যা।'

রাস্তায় সনাতন বাবুর সংগে দেখা। উনি বললেন, 'ডাক্তার, তুমি পোল্টের কান দেখে পয়সা নাওনি? যাক ভালোই করেছো। আমি ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়েছি, ও আমার ফাইফরমাস খাটে। আর আমার বাড়িতেই দু'মুঠো খায়। বাকি সময় ও দোয়ারকার রিক্সা চালায়। আমি পোস্ট অফিসে ওকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছি। আমি ওকে বলে দিয়েছি, দু'পয়সা জমা। তোরই উপকারে লাগবে।

কালী ঘোষের ধূপের কারখানায় পোল্টে বেশ কিছুদিন কাজ করছে, আজ ও সনাতন উকিলের বাড়িতে বসে নিজেই ধূপ তৈরী করছে। আমাদের পাড়ার লোকেরাই ওদের খদ্দের। মোটামুটি ভালোই রোজগার করছে।

সনাতন উকিল ধৈর্য সহকারে বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছেন ওকে বাড়িতে বসেই।

রাত তখন বারোটা হবে। পোল্টে আমার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে।

'সনাতন উকিল বড় অসুস্থ। ডাক্তারবাবু, একটু চলুন।' পোল্টে ব্যস্ত স্বরে বললো।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটলাম পোল্টের সংগে। সনাতন বাবুর দু'বার করোনারী

অ্যাটাক হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই সনাতন বাবু বলতে লাগলেন, 'ডাক্তার, বুকের ব্যথাটা বড় বেড়েছে। আমি আর বাঁচবো না। তবে আমার রিসার্চ কমপ্লীট। আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে ভালবাসা দিয়ে যা পারা যায় তা পুলিশ আদালত পারে না। তোমার বোধহয় মনে আছে আমি একদিন বলেছিলাম, রাস্তার জঞ্জালও মানুষের কাজে লাগে। এই আমার পোল্টে ছিলো ঐ জঞ্জালের মতো। আজ সে আমার পাড়ার একটা ছেলের মতো ছেলে, মানুষের মতো মানুষ।'

আমি ইঞ্জেকশনটা ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছি। আমি বললাম, 'সনাতন বাবু, আপনি বেশি কথা বলবেন না। আমি এই ইঞ্জেকশনটা দিচ্ছি। এখুনি ব্যথা কমে যাবে।' সবকিছু পরীক্ষা করে আমার মনে হলো—এযাত্রায় আর সনাতন বাবুকে রাখা যাবেনা। পোল্টেকে আমি বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে বললাম, 'অবস্থা খুবই খারাপ। পাড়ার লোকদের খবর দে, ও'কে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

আমি বাড়িতে ফিরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাম্বুলেন্সে টেলিফোন করলাম। টেলিফোন ছাড়ার সংগে সংগে পোল্টে আমার বাড়িতে দৌড়ে এসেছে। 'তাড়াতাড়ি চলুন ডাক্তার বাবু, উকিল বাবু কিরকম করছেন।' গিয়ে দেখি সনাতন বাবু খুব ঘামছেন নাড়ি খুবই ক্ষীণ। আমি প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশনটি তৈরী করছি, আর সনাতন বাবু তীব্র শ্বাসকষ্টের মধ্যে বলে চলেছেন, 'ডাক্তার, আমার পোল্টেকে একটু দেখো।'

আমি সনাতন বাবুর নিস্তেজ পেশীতে ছুঁচ ফোটাতে লাগলাম একটা, দুটো, তিনটে কিন্তু কোন কাজ হোল না। অকস্মাৎ সনাতন বাবুর বুক এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো।

পোল্টে চিৎকার করে সনাতন বাবুর বুকের উপরে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, 'আমার বাবা আজ চলে গেল। আমার আর কেউ নেই ডাক্তার বাবু।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমরা পাড়ার সবাই আছি। তোর কিছু ভাবনা নেই।'

ইতিমধ্যে সনাতন বাবুর বাড়ির সামনে বিরাট ভীড় জমে গেছে। ভীড় ঠেলে আমি বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছি আমরা সবাই সনাতন বাবুকে পাগল বলে জানতাম। কিন্তু আমার আজ মনে হলো—আমাদের সমাজে এই ধরনের পাগল যেন বেশি সংখ্যায় জন্ম নেয়।

ধীরে বহে রূপনারায়ণ

আলুর চপ, ছোলা সিদ্ধ আর মুড়ি একঠোঙা কিনে নিয়ে হুড়মুড় করে লঞ্চে উঠে পড়লুম। অসম্ভব ভীড়। সবাই কালীপুজোর ছুটিতে চলছে আপন গৃহকোণে। এতো লঞ্চ ডুবে যাবার উপক্রম।

সকাল সাড়ে আটটায় আমাদের জলরথ ছাড়লো মানকুর ঘাট থেকে। আরে ঐ ভীড়ের মধ্যে কে যেন কুঁকড়ে বসে আছে। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি ওতো আমাদের গ্রামের বঙ্কু আড়ি। 'ও বঙ্কু খুড়ো, দেশে যাচ্ছো নাকি?'

'হাঁগো বাবু, এই ভীড়ে কি কিছু দ্যাখা যায়!'

'খুড়ো, একি হলো জল মাপছে যে।'

'ভাটা পড়েছে, জল খুব কম, লাঞ্চো লেগে না যায়।'

'লিলেক বাম এক বাম, এক বাম এক তিল, দো হাত,' ব্যাস একটা সজোরে ধাক্কা। আমিতো দাঁড়ানো অবস্থায় একজনের ঘাড়ের ওপর পড়লুম। সাড়ে দশটায় জোয়ার, জোয়ার না এলে লঞ্চ আর নট নড়ন-চড়ন।

'বঙ্কু খুড়ো, চা খাবে নাকি?'

'ও ভাই দু গেলাস চা দেবে?'

'চা হবে না, দুধ ফুরিয়ে গ্যাছে।'

আর কি করা, ক্যাপস্টান ফিল্টার কিং পর পর চালাতে লাগালাম। লঞ্চ একটু নড়লো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ জোয়ার লেগেছে। ঘড়ির কাঁটাটা এগারটা ছুঁই ছুঁই করছে।

'নিতাই, ভাল করে পাটাটা লাগা বাবা। দেশে খুব কম যাওয়া আসা, অভ্যেস নেই, একটু হোলেই হয়তো পপাত জলের তলে।'

'ভয় নেই, 'লাব' তুমি। আমায় কিট ব্যাগটা বরং দিয়ে দাও।'

একটুখানি গিয়েই আমাদের বাঁধ আর ওর ধারেই গুরাকাকুর দোকান।

'কি দাসুখুড়ো, এসে গ্যাছো—তাহলে খেলা হচ্ছে কাল?'

গুরুকাকুর ঠোঁটে চাপা বিড়ির ভেতর দিয়ে কথাগুলো বেরোলো।

'নিশ্চয় হবে, আমি তো সংগে করে শীল্ড, ফুলের মালা, চা, বিস্কুট সব কিনে নিয়ে এলুম।'

আমি বিশ্বাসভরে কথাগুলো বললাম।

'যাও বাবু, বাড়ি গিয়ে এখন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করো। বিকেলে কথা হবে।'

গুরুকাকু সাইকেলে পাম্প দিতে দিতে বললো।

বাড়ি ঢুকে কাকীমাকে সামনে পেয়ে একটা গড় করলাম। কাকীমা কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'দাঁড়াও একটু সরবত করে নিয়ে আসি।'

কাকাবাবু আমাদের গরুর জাব দিচ্ছেলেন; খোলের জল খড়ে মেশাতে মেশাতে বলতে লাগলেন, 'দাসু, তুই গ্রামে কিছু করতে যাসনি। আমাদের কত প্রিয় বৌমা এই অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তার স্মৃতিতে এত টাকা খরচা করে গ্রামে তুই ফুটবল খেলা দিচ্ছিস। কোথায় সবাই সহযোগিতা করবে, তা নাকরে ঐ পশ্চিমপাড়ার যুবতীর্থ ক্লাব তোদের খেলার দিনে নাকি পাল্টা স্পোর্টস করবে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কাকু কি হবে? কাল ফাইনাল খেলা, সভাপতি, প্রধান অতিথি সব নেমন্তন্ন হয়ে গেছে যে।'

'তুই চিন্তা করিসনি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি পাড়ায় বেরিয়ে দেখি ফয়সালা করতে পারি কি না।'

কাকু আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

কাকীমা সরবত হাতে দাঁড়িয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'এটা খেয়ে নাও। আমাদের ক্লাব নবযুবক সংঘের শত্তুর ওরা। গত দু বছরের খেলায় আমাদের গ্রামের এত নাম হয়েছে যে কি বলবো। হিংসেতে জ্বলে গেলো যুবতীর্থ ক্লাবের ছেলেরা।'

খাওয়া দাওয়া সেরে দিবানিদ্রার বিরতি হলো বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ। কাকীমা চা বিস্কুট নিয়ে হাজির। চা খেতে খেতে কাকু বললেন, 'সব মিটে গেছে। কাল খেলা হবে।'

'তাহলে কাকু, আমারা রিক্সা করে রাণীচকের বাজার থেকে কালকের খেলার জলযোগের জন্যে কেনাকাটা করে আসি চলো। আর যাবার পথে মুচিপাড়ায় গিয়ে একদল জগঝম্পা বাজনা বায়না করে আসবো।'

রিক্সা চলতে লাগলো আমাদের পি. ডবলিউ. ডি বাঁধের ওপর দিয়ে। পাশে রূপনারায়ণ নদী বয়ে চলেছে। নদীর চড়াতে আলুচাষের জমি তৈরী হচ্ছে। আর বাঁধের ভেতরে ধানের নীল ডগাগুলো হাওয়ায় উড়ছে। ধানের শীষ এখনও আসেনি। কাকাবাবু বলতে লাগলেন, 'এবারে ধান ভালই হবে। তবে জলের একটু চাপ আছে মাঠে। এবছরের সাংঘাতিক বর্ষায় ভাগ্যক্রমে আমাদের গ্রাম বন্যার হাত থেকে বেঁচেছে। কোটালের পর আমাদের গ্রামের পোলের কপাট তুলে কিছু জল বের করে দিতে হবে। নদী এখন কানায় কানায় ভরে রয়েছে, তাই একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

আমাদের রিক্সা মুচিপাড়ায় এসে পড়েছে। রিক্সা থেকে নেমে গুপি মুচির বাড়ি ঢুকলাম। আশি টাকায় রফা হোলো খেলার বাজনা। রিক্সা এগোতে লাগলো। হঠাৎ একজন লোক টলতে টলতে এসে আমাদের রিক্সা আটকালো। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরুচ্ছে ঃ 'কি ডাক্তার কাল খেলা হবে তো? আমরা দেখতে যাবো।' এড়িয়ে এড়িয়ে কথাগুলো বলে ফেললো সে।

'তোমরা সবাই এসো কাল তিনটের সময়।' আমার কাকু তাড়াতাড়ি কথাটা বলেই শম্ভুকে বললো রিক্সা চালাতে। কাকু আবার শুরু করলেন 'আজকাল বামফ্রণ্ট সরকারের দৌলতে গ্রামের দিনমজুরের হাতে পয়সা এসেছে, কিন্তু হলে কি হয়, ঐ মদ একেবারে সব শেষ করে দিলো।'

বাজার করে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। আজ কালী পুজোর দিন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাঁধের ধারে প্যাকাটি জেলে হাতে করে মশালের মত ঘোরাচ্ছে আর বলছে........

'ধারে মশা ধা

লাল বনকে যা।'

আমি কাকুকে এর মানে জিজ্ঞেস করলাম। কাকু বললেন, 'এর মানে হলো, যেখানে যত মশা আছ সবাই কেটে পড়ো, আর তা না হলে তোমাদের পুড়িয়ে মারবো।'

গ্রামে কালীপুজোর রাত্রিটা খুব জাঁকজমক মনে হলো না। বাজির খুব আতিশয্য নেই। খালি চোখে পড়লো—টিমটিমে প্রদীপ দিয়ে সাজানো বাড়িগুলোর ফ্যাকাশে দেয়ালে ঘুঁটেগুলো উঁকি ঝুঁকি মারছে।

খেলা শুরু আজ। আমাদের বাড়িতে লুচি আর আলুর দম তৈরী হচ্ছে

সকাল থেকে। পণ্ডা সাইকেলে করে রাণীচক থেকে পাঁচকেজি মিহিদানা নিয়ে এলো। চারখানা করে লুচি, খানিকটা করে আলুরদম, মিহিদানা দিয়ে দুশো প্যাকেট বাঁধা হলো ক্লাবের মেম্বার আর প্লেয়ারদের জলযোগের জন্যে। সকাল থেকে মাইকে বাজছে গোষ্ট গোপালের গান: 'কি মাছ ধরিছো বড়শি দিয়া, ও দরদী…।' আর মাঝে মাঝে ঘোষণা হচ্ছে, 'আনন্দ সংবাদ, আজ বৈকাল তিন ঘটিকায় সত্যভামা স্মৃতি শীল্ডের ফাইনাল খেলা কুমারচক ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবারের খেলায় প্রতিযোগীরা হলেন দরী অযোধ্যা স্পোর্টিং ক্লাব এবং যোত কানুরামগড় শ্মশানবাসী ক্লাব। আপনারা দলে দলে যোগদান্ করিয়া আমাদের এই খেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।'

বেলা দুটো থেকেই বেশ লোক জমতে শুরু করেছে। গুপি মুচির বাজনার দল তাদের ঢোল, কাঁশি আর বাঁশিতে আসর বেশ জমিয়ে তুলেছে।

কুমারচকের ঘাটে দশ-বারোখানা নৌকো এসে ভিড়েছে দল দল লোক নিয়ে। খেলার মাঠ একেবারে ঘাটের ধারে। মাঠের চারদিকে বাঁশঝাড়, হিজল, শিরীষ আর জাম গাছের বেড়াজাল। এক বিশাল সবুজের সমারোহ।

খেলার শুরুতে আমার ছোটভাই অসীম তার উদাত্ত কণ্ঠে তার বৌদির প্রতি শ্রদ্ধা জানালো কবিগুরুর সেই বিখ্যাত গান দিয়ে: 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে।'

ঠিক তিনটে পনেরতে রেফারী হুইসেল দিলো। খেলা শুরু। খেলার শুরুতে দশ মিনিটের মধ্যেই গড় চারখানা গোল করলো দরীর বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত দরী তিনখানা গেল শোধ করলো। কিন্তু রেফারী অন্তিম হুইসেল দিয়ে যোত কানুরামগড় শ্মশানবাসী ক্লাবকে বিজয়ী ঘোষণা করলো। বিজয়ীরা জগঝম্পা বাজনার সাথে সাথে শীল্ড মাথায় নিয়ে টুইস্ট নাচতে লাগলো।

দুপক্ষের কমপক্ষে তিনটে ছেলে খুব ভাল খেলেছে। আমার মনে হতে লাগলো এই সব ছেলেদের যদি সুযোগ দেওয়া যায়, প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে এরা একদিন নিশ্চয় বড় খেলোয়াড় হতে পারবে।

গতকালের ক্লান্তির জন্যে ঘুম একটু দেরীতে ভাংগলো। এবারে চায়ের আসর শুরু। গুরুপদ কাকু চলে এলেন। সন্তোষকাকু পাশের দাওয়াতে শুয়ে শুয়েই বলে উঠলেন, 'তোদের চা হলে আমাকেও একটু দিস। আমাদের চা হতে অনেক দেরী।'

এই গুরুপদকাকু আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। খুব রসিক লোক। চায়ে চুমুক দিয়েই বলে উঠলেন, 'একি, চায়ে চিনি দেওয়া হয়নি!'

কাকীমা তাড়াতাড়ি দু চামচ চিনি মিশিয়ে দিলেন। আমি তখনই হঠাৎ বলে উঠলাম, 'কাকু, তোমার মনে পড়ে, তোমার বিয়ের সময় তোমার শ্বশুরবাড়িতে চিনিছাড়া চা দিয়েছিলো। সেই নিয়ে কি হই হই। শ্যালারা ছোট লোক, ব্যাটারা চাষা, আরও কতকি সম্বোধন করে তোমার শ্বশুরদের গুষ্টির তুষ্টি করেছিলো তোমার বরযাত্রীরা ?'

এই কাকার বিয়েটা আমার খুব মনে পড়ে। বর চলেছে পাল্কী করে বাজনা বাদ্যি নিয়ে। হ্যাসাকের আলোয় বাঁধ আলোকিত। আমরা বাকি বর যাত্রীরা চলেছি নফর পালের 'ভাউলে' কোরে। যেতে হবে শ্যামসুন্দরপুর। অনেকটা পথ। নদীতে ভাঁটা পড়েছে। গুন টেনে আমাদের ভাউলে চলেছে ধীর গতিতে। নদীর পাশ দিয়ে বাঁধ আর বরের পাল্কী দেখতে দেখতে চলেছি। ভাউলেতে বোসে নদীর হিমেল হাওয়ায় একটু ঘুম এসে গেছে। হঠাৎ আমার বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই দ্যাখো, বরের পাল্কীর কাহাররা এবং বাজনদাররা রাণীচকের দিশী মদের দোকানে ঢুকছে। আজ একটা কান্ড হবে!'

সংগে চার পাঁচজন বরের বন্ধুও কারণসুধা পানার্থে বাঁধের ধারে বটগাছের তলায় বাঁশের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে।

অবশেষে আমাদের ভাউলে শ্যামসুন্দর পুরের ঘাটে ভিড়লো। আমরা কনের বাড়ির 'দলিজে' আসন গ্রহণ করলাম। আমাদের অনেক পরে বর, বাজনাদার এবং বরের মদ্যপ বন্ধুরা পেঁছিলো। অবস্থা খুবই খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরকে মানে আমাদের এই গুরুপদ কাকুকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো। এদিকে কনের বাড়ির তঁতবাড়িতে চললো বাজী ফাটানো। হুশ কোরে একটা হাওয়াই উঠলো আকাশে আর তার পরেই একটা বিকট আওয়াজ। পরক্ষণেই আকাশে ভেসে উঠলো একটা ফেস্টুন, 'গুরুপদ ও পুষ্পরাণীর শুভ বিবাহ।' এরপরই চললো বাবলা গাছে ঝোলানো গাছবোম ফাটানো। কানের পর্দা ফেটে যাবার দায়।

এদিকে একেবারে বেসামাল অবস্থায় লক্ষ্মী মাজী, ভোলা সাঁত, আর আমাদের ভগীরথ খুড়ো ঐ চিনিছাড়া চা খেয়ে রেগে মেগে চেঁচাতে লাগলো, 'ঐ শ্যালারা একেবারে ইতর। আমাদের সংগে 'বেলক্যামি' জুড়েছে। বাপের জন্মে চা

খেতে শেখেনি। ঐ শ্যালাদের বাড়িতে আমরা খাবনি।' এইনা বলে সকলে মিলে নদীর ঘাটে বাঁধা ফাউলেতে উঠে বসলো। কনের বাড়ির কর্তারা বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'ভুল হয়ে গেছে। এখনি চিনি মিশিয়ে দিচ্ছি চায়ে। আপনারা চলে যাবেন না। আমাদের খাবার দাবার নষ্ট হবে।'

আমাদের কর্তারাও অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু নেশার ঝোঁকে কে শোনে কার কথা। অগত্যা নিজেদের বরযাত্রীরা কিছু না খেয়ে ফিরে যাচ্ছে দেখে আমরা সকলেই নিরম্বু উপবাস করে ভাউলেতে উঠে বসলাম।

রাণীচকের কাছে এসে দেখি শীতলা স্টীমার ছেড়ে দিয়েছে। ওর পাখার ঝাপটায় আমাদের ফাউলে টলমল। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। কুমারচক পেঁছিতে এখনও আধঘন্টা বাকি। হঠাৎ সূর্য কাকু বলে উঠলো, 'এই বাবু, তুই লক্ষ্মী চরিত্রটা বলতো।'

আমাদের গ্রামের বাবু সামন্ত সুর করে গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো :

'ফাগুন পূর্ণিমা নিশি
নির্মল আকাশে তাহে দোল
পূর্ণিমার মলয় বাতাস'......ইত্যাদি।

লক্ষ্মী চরিত্র বলাও শেষ আর আমাদের ভাউলে ঠেকলো আমাদের ঘাটে। আমরা নদীর পলি দিয়ে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে উঠে এলাম গুরুপদ কাকুদের বাড়ি। নগেন দাদু মানে গুরুপদকাকুর কাকা আগে থেকে আমাদের উপোসের খবর জেনে আমাদের সকলকে দই, মুড়ি এবং মুড়কি সহকারে ফলার খাইয়ে আমাদের চা বিভ্রাটের বিরুধে বিক্ষোভ স্বরূপ অনশন ধর্মঘট ভংগ করালেন।

আমি প্রায়ই ভাবি গ্রামদেশে এখনও কিছু মদ্যপ বরযাত্রী এ রকম বিপত্তি ঘটায় কিনা। এর একটা পরিবর্তন প্রয়োজন।

'মাছ লিবে নাকি গো'—হঠাৎ আমাদের চমক ভাংগলো কাঞ্চনীর মায়ের গলার আওয়াজে।

'কি মাছ আছে গো'

'ছোট টাংরা আর ঘুষা মাছ'

'কত করে দেবে' ?

'যা নেবে সব দশটাকা'

'এত ছোট মাছ দশটাকা, আটটাকা হবেনি গো ?'

'টাকা নেবে তো দাও, নাহলে আমি চললুম'

'আরে কাঞ্চনীর মা, তুমি রাগ করছো কেন, সব মিলিয়ে এককিলো দাও।'

'ঠেকা নিয়ে এসো'

মাছ নিয়ে আমার কাকীমা আমায় বললেন, 'দাসু, তুই দাম করতে জানিসনি, গ্রামে আরও দাম করতে হয়।'

আমি কাকীমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে কাঞ্চনীর মাকে বললাম, 'হ্যাঁগো এবছরে ইলিশ মাছ কিরকম পড়েছিলো আমাদের রূপনারাণে?'

'এই বছরে বেশী পড়েনি। গত বছর ভাদ্র মাসে বেশ পড়েছিলো।'

কাকাবাবু বললেন, 'আজকাল নদীর অবস্থা খুব খারাপ। এখন তিওর বাগদীদের মাছের পয়সায় আর সংসার চলে না। এখন অনেকে নৌকা, জাল সব বিক্রি করে দিয়ে চাষের কাজে লেগে পড়েছে। এবারেই তো আমাদের পুরো চাষের কাজ করলাম ঐ তিওরদের ছেলেদের নিয়ে।'

চা, জলখাবার সমাপন করে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম পরিক্রমায়। প্রথমেই আমাদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে ঠেক খেলাম। এই খানেই রয়েছে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মাস্টারমশায় পরেশ চন্দ্র সিকদার মশায়ের স্ট্যাচু। এটি আমাদের এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা চাঁদা তুলে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পরেশ-বাবু এক অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। তখন আমি খুব ছোট, পরেশবাবু অবিভক্ত বাংলার ঢাকা থেকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরী নিয়ে এলেন। তখন স্কুলের এই পাকা বাড়ি ছিল না। একটা চালা ঘরে স্কুল বসতো। উনি খেতেন মাজীদের বাড়ি আর থাকতেন আমাদের আশ্রমের একটি ঘরে। ওনার সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও ছোটদের পড়াবার পদ্ধতি সত্যি সুন্দর ছিলো। উনি গ্রাম্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সকলকে ভালবেসে সকলের মন জয় করে ফেললেন। আমাদের গ্রামের লোকেরাই একখানি ঘর এবং রান্নাঘর সমেত একটি ছোট্ট বাড়ি করে দিল তাঁকে।

এরপর তিনি স্ত্রীকে পূর্ববঙ্গ থেকে নিয়ে এলেন। এখানে তাঁর দুই কন্যা-সন্তান হলো। একসময় ওঁর স্ত্রী এই গ্রামেই মারা গেলেন। বহু বছর কাটিয়ে উনিও দেহ রাখলেন একদিন। সেদিনের কথাটা আমার খুব ভাল মনে পড়ে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো আমাদের এই স্কুল প্রাঙ্গণ। কেউ দিল তার সবচেয়ে ভাল নিমগাছটা। কেউ দিল ফুলের খরচ।

কুড়ুল দিয়ে চেরাই চললো ঐ সাঁওতদের নিমগাছটা। চিতা সাজানো হলো রূপনারায়ণের ধারের চড়াতে। জলন্ত চিতাতে একমুঠো করে ধুনো দেবার জন্য প্রচন্ড ঠেলাঠেলি। কে আগে শ্রদ্ধা জানাবে। আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ ওঁর জন্যেই হয়েছে। আজও তাই গ্রামের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হলে একবার পাল্কী থামিয়ে বরকণে পরেশবাবুর এই মূর্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রণাম করে।

হাঁটতে হাঁটতে পূব পাড়ার দিকে চলতে লাগলাম। ও বাবা! অম্বিকা পোড়ের গোলা ঘরের এ কি অবস্থা!

'এই যে নরেন মাজী যে, কি গো পোড়েদের গোলা ঘরের এই অবস্থা!'

'হাঁ দাসুবাবু, অথচ বিশবছর আগে এই গোলাঘর কি ছিলো। ঐ শয়তান অম্বিকাটা আর বেঁচে নেই। বছর পাঁচেক হোলো ও মারা গেছে। বাঁচা গেছে। গ্রামের সমস্ত বৌ ঝি গুলোর ইজ্জত বেঁচেছে। মনে পড়ে দাসুবাবু? পশ্চিম পাড়ার ক্ষ্যাপা মোড়ল অম্বিকার কাছ থেকে একশো টাকা ধার করেছিলো। ধার শোধ করতে পারলো না কড়ারের সময়ে। অম্বিকা রাক্ষসটা টাকার বদলে চাইলো ক্ষ্যাপাটার সোমত্ত বৌকে। ঐ বেহায়া ক্ষ্যাপাটা ওর বৌকে ভুলিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো এই গোলা ঘরে। অম্বিকা যমটা ঐ ডবগা বৌটাকে সারা রাত ধরে চিবিয়ে খেয়েছিল। কিন্তু কি হলো?—অম্বিকা ধরা পড়ে গিয়েছিলো ওরই চাকর সুধার কাছে। সুধা গ্রামের মোড়লদের সব কথা বলেছিল। গ্রামের মুখ্যেরা একহাজার টাকা কালী পুজোর চাঁদা নিয়ে অম্বিকাকে রেহাই দিলো। লজ্জায় ঘেন্নায় ক্ষ্যাপার বৌটা কলকে ফুলের বিচি খেয়ে আত্মহত্যা করলো।'

একটা বিষাদসূচক 'হুঁ' বলে আমি আবার এগোতে লাগলাম। নরেন মাজীও আমার সাথী হলো। ওই হৈবতে মানে আমাদের গ্রামের পূর্বদিকের বাঁধের কাছে ওর ধানের জমি। তাই দেখতে যাচ্ছিলো।

বামফ্রন্ট সরকার হৈবতের দুধারে এবং আমাদের স্কুল গোড়া থেকে বাঁধের দুধারে বৃক্ষরোপণ করেছে। নানান রকমের গাছ। ইউক্যালিপটাস, দেবদারু, সোনাঝুরি এবং নিম গাছগুলো বেশ সজীব হয়ে উঠেছে। নরেন মাজী বললো, 'জান দাসুখুড়ো, এই সব গাছ রক্ষে করার জন্যে দৈনিক আট টাকা রোজ দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দু জন লোক নিয়োগ করেছে। এই দৌলতে খাঁদু বেরা এবং কেষ্ট মাজীর ছেলের হিল্লে হয়েছে। ওরা গাছে জল দেয় এবং গরু ছাগলের

হাত থেকে গাছ রক্ষা করে।'

'গাছগুলো বড় হলে এই জায়গাটা একটা ভাল পিকনিক স্পট হবে। শীতে চড়ুইভাতি জোর চলবে'—আমি সানন্দে বললাম।

বাড়ি ফিরে দেখি অনেক রুগী অপেক্ষা করেছে। আমি তাদের পরীক্ষা করতে বসে গেলাম। অনেকে আমাকে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাইলো। আমি নিলাম না। আমার এই বদান্যতা মোটেই নিজের নাম কেনার জন্যে নয়, নিজের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে। আমি এই গ্রামের ছেলে হয়ে এখানেই আমার প্রাক্‌টিশ করা উচিত ছিলো, কিন্তু তা না করে স্বার্থান্বেষীর মত কলকাতায় গিয়ে পসার জমালাম। আমার এই অন্যায়ের ক্ষমা আছে কিনা জানিনা।

রোগী দেখা শেষ হলে আমার কাকু বললেন, 'চল আমাদের বাগানটা একটু দেখে আসবি।'

বাগানে ফুলকপির চারা লাগাতে লাগাতে কাকু বলতে লাগলেন, 'এবছরে গরমের ধান হয়নি। এখনতো রূপনারায়ণের ধারে সব গ্রামেই পাম্প বসেছে গরমকালে নদী থেকে মাঠে জল দেবার জন্যে। আই-আর-এইট ধান ভালই হচ্ছে। কিন্তু গত দুবছর অনেকে, বিশেষ করে বড় চাষীরা গরমেন্টকে জলকর দেয়নি। তাই এবছর আর পাম্প চালু হয়নি। কি অন্যায়, কর এইভাবে বাকি ফেললে গরমেন্টই বা কি করবে! পাম্প হাউসের লোকের মাইনে আছে, ডিজেলের দাম আছে। সরকার আজকাল সত্যিই কিছু করছে। আই-আর-এইট ধান ফলেও খুব বেশী। ধান বেচে চাষীদের অবস্থা বেশ ভালই। তবে যাদের জমি নেই তারা মার খাচ্ছে।'

বিকেলে কাকু বললেন, 'চল একবার আমাদের আশ্রমটা বেড়িয়ে আসবি। নতুন মন্দির হয়েছে।'

আমাদের ছোটবেলায় আমারই দাদু এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দু কামরা মাটির ঘর করে। শ্রীরামপুর যোগদাসৎ সংঘের সচ্চিদানন্দ ঠাকুর সেই আশ্রমের উদ্বোধন করেছিলেন। সারা গ্রাম মেতে উঠেছিলো। বড়রা গুরু-দেবের সঙ্গে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়েছিলো খোল করতাল আর হারমোনিয়াম নিয়ে। আমরা ছোটরাও পেছন পেছন চলেছিলাম গাইতে গাইতে।

সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের তিরোধানের পর অনিলানন্দ ঠাকুর ওনার স্থলাভিষিক্ত

হয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে উনি আমাদের গ্রামে যাচ্ছেন বছরে একবার করে। ঠাকুরের আগমনে প্রতিবছর দু'দিন করে আশ্রম উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। আমাদের গ্রামের পাশাপাশি গ্রাম যেমন কৈজুড়ি, বাঁকিবাজার, পাইকান এবং রাণী-চকের লোকেরাও এই উৎসবে সামিল হন। চলে দীক্ষা গ্রহণ, পুজো পাঠ আর ভোগবিতরণ। গতবছর নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় আড়াই হাজার লোক প্রসাদ পেয়েছিলো। খিচুড়ি, আলুকুমড়োর তরকারী আর পেঁপের টক কি ভালই লেগেছিলো। যাইহোক, ঐ কদিন আমাদের গ্রামে একটা আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিলো।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। বাড়ি ফিরে চা খেয়ে গুরুপদ কাকুর দোকানে গেলুম।

দোকানে গিয়ে দেখি আসর বেশ জমজমাট। অন্তা সাঁত, ব্যাঁকা কর, ভীম দাস এবং গোষ্ট মাইতি তাস খেলছে। গুরুপদ কাকু ডিম বিক্রি করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা টুল এগিয়ে দিল গোষ্ট খুড়ো।

'তাস খেলা ছাড় বাপু। আমি তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করতে এলুম—' আমি বললাম।

অন্তা সাঁত বিনয়ের সঙ্গে বলে উঠলো, 'আমরা দাঁড়ি মাঝি লোক। তোমার মত লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে কি গল্প করার যোগ্য আমরা?'

'তাতে কি হয়েছে তুমি তোমার নৌকোর কিছু কথা বলো শুনি।'

অন্তা আর কি করে। কাঁচুমাচু করে শুরু করলো: 'তুমি তো জান বাপু আমি তো বারি মাজীদের বালির নৌকার মাঝি ছিলাম। তখন রূপনারায়ণের বালির দাম কলকাতার বাজারে। আমরা গাড়ুদর চড়া এবং কুলটিকরির চড়াতে বালি তুলতাম। চড়াতে নৌকা লাগিয়ে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে বালতি করে চেঁচে চেঁচে জলের ভেতর থেকে বালি তুলে নৌকায় ফেলতাম। শীতকালে সে কি কষ্ট। নৌকা বোঝাই হোলে ভাটার টানে নৌকা চালাতাম। কোলাঘাট, গেঁয়ো খালি দিয়ে গঙ্গায় পড়তাম। তারপর একেবারে বাগবাজার ঘাটে বালি খালাস করতাম। বর্ষাকালে বাক্সীর খাল দিয়ে দামোদরে পড়তে পারলে সময় অনেক কম পড়তো কোলকাতা যেতে। ঐ সময় আমাদের গ্রামে কত নৌকা; হাটুয়াদের একখানা, মাজীদের তিনখানা, আড়িদের একখানা আর কত বোলবো।

কিন্তু বাপু সেই বাংলা পঞ্চাশ সালে আশ্বিনের ঝড়ে আমার নৌকাখানা

গোপীগঞ্জের কাছে গেল ডুবে। ডুবুরি নিয়ে এসে নৌকা তোলা হোলো কিন্তু নৌকা আর চালু করা গেল না। কাঠ সব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই ঝড়ে এদিককার প্রায় সব নৌকাই ডুবে গিয়েছিলো। আমরা সব বেকার হয়ে গেলাম। সাথে সাথেই এল সেই চরম দুঃখের পঞ্চাশের আকাল। এই আশ্রমের মাঠে লংগরখানায় এক হাতা বজরা সেদ্ধ খেয়ে কোনভাবে না মরে বেঁচে ছিলুম।'

এমন সময় পরাণ পাত্রের স্ত্রী দোকানে এলেন আলু কিনতে। আমি ওনাকে দিদি বলেই ডাকি, উনি আমার পিতাঠাকুরের সংগে বাবা পাতিয়েছিলেন। এই দিদির সংগে আমরা পাড়ার সকলে খুব খোলামেলা আলোচনা করতাম। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দিদি, তুমি বলতো তোমাদের সময়ে শাশুড়ীরা বৌদের কি রকম অত্যাচার করতো?' দিদি বলতে লাগলো, 'ওরে বাবা, আমার নিজের শাশুড়ী কি খাণ্ডারণী ছিলো। পেট ভরে দুবেলা খেতে দিত না। একখানা ভাল কাপড় ভেংগে পরতে দিত না। তোমার জামাইবাবু তখন বাঁকুড়ো মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়তো। তখনও এল-এম-এফ পাশ করেনি। রোজগার পত্র শুরু করেনি। আমার শাশুড়ী প্রায়ই বলতো—এখনও বাপের ভাতে আছ। অত কিসের আরাফা। একদিন চাষে দশজন মুনিশ লেগেছে। সারা সকাল ধরে বাসন মেজেছি, রান্না করেছি। বেলা তখন এগারটা হবে বোধ হয়, আমি মাকে বোললাম—আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, আমাকে চারটি মুড়ি দিতে, উনি হঠাৎ এতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন—'বাথড়ে খালি গিলতে জানো। এখন ওসব হবে না। আগে তিন হাঁড়ি ভাত রান্না কর, পরে খাওয়া।' এরপর আমি সারাদিন শুধু কেঁদেছি আর কাজ করেছি। বিকেলের দিকে ভাবলাম এজীবন আর রাখবো না। এ অত্যোচার আর সহ্য হয় না। সন্ধ্যের অন্ধকারে আমাদের গোয়াল ঘরে চলে গেলাম। গরুর দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে গোয়াল ঘরের পাড়নে ঝুলে পড়লাম। খুব ছট্ পট্ করতে লাগলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। আমার এই ছট্‌পটানি দেখে আমাদের গরুগুলো জোর হাম্বা হাম্বা করে চেঁচাতে শুরু করলো। গরুর ডাকে আমার শ্বশুর হ্যারিকেন নিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকে দ্যাখে আমার ঐ অবস্থা। তাড়াতাড়ি কাস্তে দিয়ে দড়ি কেটে আমায় নামিয়ে ফেললো। মরা আমার আর হোলো না।'

গুরুপদ কাকু সব শুনে বললো, 'ওর শাশুড়ী এমনিতেই খুব খচ্চর ছিলো। সামান্য কিছু নিয়ে পাড়ার লোকের সংগে প্রায়ই ঝগড়া করতো।'

এই সময় লণ্ঠন হাতে নিয়ে গোবিন্দ মাজী দোকানে এলো বিড়ি কিনতে। আমি বলে উঠলাম, 'এই তো আমাদের গ্রামের শিব ঠাকুরের গাজনের মূল সন্ন্যাসী এসে গেছে।' গোবিন্দ মাজী বলতে লাগলো, 'আর বাপু শরীর খারাপ হয়ে গেছে, আজকাল আর পারিনা। পুরো একটানা বিশ বছর আমিই ছিলাম গাজনের মূল সন্ন্যাসী।' এই গোবিন্দ খুড়ো তখন তাড়ি আর মদের পিপে ছিলো। গায়েও ছিলো অসম্ভব শক্তি। গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী তখন প্রথা ছিলো নীল ষষ্টীর দিন শিবের মাথায় প্রথম জল ঢালবে গ্রামের প্রধান মুখ্যের বৌ। কিন্তু গোবিন্দ খুড়ো তাড়ি খেয়ে চেঁচিয়ে জবরদস্তি করে ওর বৌকে প্রথম জল ঢালতে দিতে হবে বলে ঝগড়া করতো। প্রথম জল ঢালার অধিকারের যুক্তি হোলো ও মূল সন্ন্যাসী। গ্রামের মাতব্বররা কেন এই অধিকার দিত না জানি না। এই নিয়ে প্রত্যেক বছর একটা মারামারি দাংগা বাধার উপক্রম হবেই।

রাত হয়ে গেছে। গোবিন্দ খুড়ো বললো, 'আজ কালী তলায় যাত্রা হবে। এবারে দশ মহাবিদ্যা পুজোয় যাত্রা কম্পিটিশন শুরু হচ্ছে। তিনরাত্রি ব্যাপী তিনটে দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। আজ হবে 'খুনির চোখে জল', কাল 'জন্মের অভিশাপ' এবং তার পরের দিন 'শ্মশানের ঘুম নেই।'

ভীড়ে ভীড়। কোনও ভাবে আমি কর্মকর্তাদের কাছাকাছি যেতেই আমাকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে মঞ্চের সামনে একজনকে উঠিয়ে দিয়ে বসতে দিলো। মোটামুটি ভালই লাগলো। তিনটি পালার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগলো কুলটিকুরি গ্রামের 'জন্মের অভিশাপ'। বিখ্যাত উল্কা নাটকটার নাম পরিবর্তন করে পরিবেশন করলো ওরা। অভিনয় ভালই করলো প্রত্যেকে। খালি মাঝে মাঝে আমায় কিছু সংলাপের গ্রাম্য উচ্চারণ হাসির খোরাক জুগিয়ে ছিলো। বিচারে কুলটিকুরির দলই প্রথম স্থান অধিকার করলো।

সাতদিন ধরে এই দশমহাবিদ্যা ঠাকুরের মেলা চললো। দুটি তেলেভাজার দোকান এবং একটি রেস্টুরেন্ট মানে মদের দোকান বসেছে, বাকি আরও দশটি মনিহারি দোকান বসেছে। একদিকে পুতুল নাচ হচ্ছে। যাত্রার আগে দুরাত্রি সিনেমা হয়ে গেছে। ধঞ্চে মানে একরকমের জ্বালানী গাছ কেটে সেই ক্ষেতের উপর বিরাট জায়গা জুড়ে মেলার আসর জমেছে। নৌকো করে যারা আসবে তাদের জন্যে রূপনারায়ণের নদীর ঘাটে কাঠ ও ইট দিয়ে ঘাট বাঁধা হয়েছে।

জেনারেটার দিয়ে সারা মেলা প্রাঙ্গণ আলোকিত। আশপাশের বহু গ্রামের লোকেরা যাতায়াত করছে এই মেলায়।

পরের দিন সকালে সুধীর কাকুকে সঙ্গে নিয়ে চললুম রাণীচকের বাজারে। রিক্সা করে যেতে যেতে রাণীচক স্কুলের কাছে দেখি দুটো ঘরে টর্চের ব্যাটারী তৈরী হচ্ছে। ওগুলো কলকাতায় চালান দেয় ওরা। এই দেখে খুব খুশী হলাম। তার কারণ আমাদের এদিকে শিল্প বলতে চালকল, গমকল, কামার পাড়ায় হাঁপর টেনে আর হাতুড়ি পিটে পেরেক এবং বাবলাগাছের গুঁড়িতে লোহার ফাল লাগিয়ে চাষের লাঙ্গল তৈরী মাত্র। কোলাঘাট বিদ্যুত প্রকল্পের ইলেকট্রিক তার এসে গেছে। এখনও রাণীচক বাজার এবং দেশপ্রাণ স্কুল ছাড়া জনসাধারণের জন্যে বিদ্যুতের কানেক্শন দেওয়া হয় নি। বিদ্যুতের প্রসার হলে কিছু ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা আছে।

আমাদের রিক্সাটা রাণীচক দেশপ্রাণ স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে আমি সুধীর কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা কাকু, এই স্কুলের মান কি রকম?' কাকু বললো, 'একেবারে বাজে, এক এক বছর ফাস্ট ডিভিশনও হয় না। ছেলে মেয়েদের মধ্যে বি.এ., এম. এ., বি-কম., বি. এস-সি অনেক পাবি। কিন্তু স্কুলের এই নিম্নমানের জন্যে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কেউ চান্স পাচ্ছে না।'

বিকেলে বাঁধে বেড়াচ্ছি। অজয় মান্নার সঙ্গে দেখা, 'কিরে অজয়, তুই কত বড় হয়ে গেছিস। এখন কি করছিস?'

'এখন কোলকাতায় একটা প্রেসে কাজ করছি। কালী পুজোয় বাড়ি এসেছি।'

এই অজয়ের মাকে চড় মেরে ওর বাবা মেরে ফেলেছিলো। পরে গলায় দড়ি দিয়ে ওর মাকে গোলাবাড়ির পাড়নে টাঙিয়ে রেখে পাড়ার লোককে খবর দিয়েছিল। সবাই দেখেই বুঝেছিল এটা আত্মহত্যা নয়। পুলিশ এলো, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ওর বাবা রক্ষে পেলো। পাড়ার লোক কোর্ট কাছারীর ভয়ে কেউ সত্যি কথাটা বললো না। এই অজয় তখন মাত্র এক বছরের শিশু। ওর বাবা বছর না ঘুরতে ঘুরতে আবার বিয়ে করেছিলো।

আমাদের ক্লাবঘরে একবার ঢুকলাম। ক্লাবের সেক্রেটারী কুমারেশ সামন্ত আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। কুমারেশ বললো, 'এমাসে মুষ্টিভিক্ষা করে আধ-মন চাল পাওয়া গেছে। আমরা আমাদের গ্রামের পাঁচজন দুস্থদের তিন কে-জি

করে চাল দিয়েছি। ‘পুওয়োর ফাণ্ডে’ পঞ্চাশ টাকা জমেছিলো। বই কিনবার জন্যে দুজন গরীব ছাত্রকে কুড়ি টাকা করে দিয়েছি। খবরের কাগজ একখানা করে রাখা হচ্ছে। আমি বললাম ‘বেশ ভালই’। আমি ডোনেশন হিসেবে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করলাম। কুমারেশ আমাকে একটা রসিদ দিলো। সত্যভামা স্মৃতি শ্মশানের খরচ বাবদ সব টাকাটাই আমি অগ্রীম মিটিয়ে দিয়েছি। আমি কুমারেশকে বললাম, ‘আমি পরশু কলকাতা চলে যাচ্ছি। কালকে ক্লাবের ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা স্পোর্টস করবো ভাবছি। এর খরচটা আমি নিজেই দেবো। তোরা আজকেই একটা মাইক বায়না করে আয়। অন্য দুই ছেলেকে রাণীচক বাজারে পাঠিয়ে কিছু প্রাইজ কিনে আনতে বল। আইটেম হবে বাচ্চাদের স্যাকরেস, পটাটো রেস, অঙ্ক রেস। এবারে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বলে একটা নতুন আইটেম সংযোজন করবো ভাবছি। বড় মেয়েদের জন্যে থাকবে মিউজিক্যাল চেয়ার আর হাঁড়িভাংগা। বুড়োদের জন্যে তাসের প্রতিযোগিতা।

পরদিন সকাল আটটা আশ্রম প্রাংগণে মাইক বাজতে শুরু করলো। ছোটদের খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রশ্নোত্তর খেলাটি খুব জমেছিলো। সকলে খুব উৎসাহ বোধ করেছে এই খেলাতে। আমার মনে হলো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েরা বেশ পিছিয়ে আছে। বড় মেয়েদের ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’ খেলাও খুব আনন্দদায়ক হয়েছিলো। একটা গান বাজিয়ে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর মেয়েরা যে যার চেয়ারে বসে পড়ছে। এইভাবে চেয়ার কমিয়ে কমিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ঠিক করা হলো। অবশেষে পুরস্কার প্রদান করলো আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রাম প্রধান শ্রী চন্দন সামন্ত।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। বাড়ি ফিরে চা খেলাম। কাকীমা পুলি পিঠে করে-ছিলো। বেশ কয়েকটা খেয়ে ফেললাম।

হঠাৎ টর্চ নিয়ে বেনো এলো। বেনো স্পোর্টসের হিসেব দিতে লাগলো। ওকে দেখে ওর ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল। ওঁর ঠাকুমাকে গ্রামের সকলে বড়বৌ বলে ডাকতো। উনি খুব পরোপকারী ছিলেন। পাড়ার কারও ছেলে হয়েছে, কেউ মারা গেছে ওমনি বড়বৌ ছুটলো নিজের একগাদা ছেলে মেয়েকে বাড়িতে ছেড়ে। সে বাড়িতে একদিন বা দু’দিন থেকে তাদের সংসার সামলিয়ে বাড়ি ফিরতো। এত ভাল লোক কিন্তু ওনার মৃত্যুটা বড় কষ্টের হয়েছিলো। জরায়ুর ক্যানসার হওয়াতে আমি

আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু কিছু করা গেল না। বড়বউ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

সুধীর কাকু আমায় বললেন, 'আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি দাসু, কাল সকালে চলে যাবি বলছিস। সকাল সাড়ে চারটের ফার্স্ট লঞ্চ কিন্তু।' কাকুর কথায় আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেলো। আমার এত বয়েস হয়েছে তবুও দেশ থেকে ফেরার সময় ভীষণ মন খারাপ লাগে। কেন যে এমন হয় আমি জানি না।

তখন রাত তিনটে হবে বোধহয়, ঘুমটা ভেঙে গেল কাকাবাবুর ডাকে। কাকীমা চা চাপিয়ে দিলেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে চা জলখাবার খেয়ে কাকা কাকীমাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কাকু আমার কিট ব্যাগটা নিয়ে আমাকে নদীর ঘাটে এগিয়ে দিতে বেরুলেন।

ঘাটে পৌঁছলাম। চারদিক বেশ অন্ধকার। জনা ছয়েক প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। কামার পাড়ার বাঁকের মাথায় নদীর জল ভাঙার সময় একটা কুলকুল করে আওয়াজ হচ্ছে। আমি কাকুকে বললাম, 'আচ্ছা কাকু, আমাদের তো এতো বয়স হলো কত জলই এই রূপনারায়ণ দিয়ে বয়ে গেছে। বলতো গ্রামের আগের চেয়ে কি উন্নতি হয়েছে?'

কাকু বলতে লাগলেন, 'ছেলেমেয়েরা অনেকেই লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু অবাধ্যতা তাদের বেড়েছে। দিশিমদের বদলে শিক্ষিত ছেলেরা বিলিতি মদ খাচ্ছে—'

লঞ্চের আগমনে আর কথা হলো না। উঠে পড়লাম লঞ্চে। ছল ছল চোখে কাকুকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। রূপনারায়ণ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

নরম পাথর

(১)

এবারে থেলনুপিক জয় করার বড় ইচ্ছে অন্বেষণের সভ্যদের। মিটিং-এ যোগ দিতে সবাই এসে গেছে। আটজনের টিম, রওনা হতে হবে একুশে মে। এবারে টিম লীডার হলেন তনিমাদি। দু'জন মেয়ে আর ছ'জন ছেলে নিয়ে যাত্রা শুরু দুন এক্সপ্রেসে।

হরিদ্বার পেঁছিলো ওরা রবিবার। রুট ম্যাপটা ভালকরে দেখে নিলো সকলে। গঙ্গোত্রী থেকে গাইড নেওয়া হবে। খেম সিং আর রমেশ চান্দারকে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে। ওরা বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করবে। গতবছর কেদার-ডোম এক্সপিডিশনে ওরা দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছিলো।

সবাই হরিদ্বার থেকে বাসে করে লংকা এবং হাঁটাপথে ভৈরবঘাটি পেঁছিলো. এখানেই তাড়াহুড়ো করে একটা পাইস হোটেলে সকলে খেয়ে নিলো। হোটেলে বিল মিটিয়ে দিয়ে গঙ্গোত্রীগামী বাসের মাথায় সবাই লাগেজ তুলে দিলো।

গঙ্গোত্রী পেঁছে বাস স্ট্যান্ডে খেম সিং এবং রমেশ চান্দারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সকলে ওখানকার সরকারী সারকিট হাউসে এসে উঠলো।

খেম সিং আর রমেশ প্রত্যেককে দশ কে-জি করে লাগেজ ভাগ করে দিয়ে বাকি মাল ওরা নিজেরা ভাগ করে নিল।

পরের দিন হাঁটাপথে সকলে চিরবাসা ছাড়িয়ে ভুজবাসায় পেঁছুলো সন্ধ্যার সময়। এখানেই লালবাবার আশ্রমে খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়লো।

পরদিন খুব সকাল সকাল উঠে হেঁটে গোমুখ। এর পরই রয়েছে মাটি আর বরফে মিশে ধূসর রং-এর গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের পরই রক্তবরণ হিমবাহের শুরু। এখানেই দলের যাত্রাভঙ্গ করতে হলো। সকলেই ক্লান্ত।

এখানেই অস্থায়ী শিবির খাটানো হলো। গাইডেরা সকলের জন্য চাপাটি তৈরী করতে লাগল। কল্লোল চটপট কফি বানাতে শুরু করে দিলো। দুখানি টু-মেন টেন্ট আর বাকি সিংগল টেন্ট খাটিয়ে ফেলা হলো। তনিমাদি ওর টু ইন ওয়ান-এ সিমলা রেডিও সেন্টার ধরেছে। হিন্দি গানের তালে তালে সকলেরই শরীর দুলতে শুরু করেছে। অর্ণব সামনে দাঁড়ানো হিমালয়ের বংশধরদের ছবি তুলতে শুরু করলো। ডান দিকে খর্চাকুন্ড, দক্ষিণ পশ্চিমে শিবলিংগ ও কেদারডোম। দক্ষিণ-পূর্বে ভাগিরথীর শৃংগত্রয়। কি অপূর্ব এরা! এরা সকলেই ক্যামেরায় একে একে বন্দী হয়ে গেলো।

পরদিন শিবির গুটিয়ে আবার হাঁটা শুরু। রক্তবরণ হিমবাহ ধরে পূর্ব দিকে চলা। থেলু নামক নালা ধরে সকলে থেলু শিখরের দিকে এগোতে লাগলো। এই থেলু শিখরেই ওদের উঠতে হবে। ওখানে পৌঁছুতেই হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা একি রাস্তা!

অসংখ্য ফাটল মানে ক্রিভ্যাস। কোনটা ছোট, কোনটা বড়।

খুব সাবধানে ক্রিভ্যাসগুলো লাফিয়ে পেরুতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ গিয়েই একটা ফুট পাঁচেক চওড়া ক্রিভ্যাস। এবারে সকলেই একটু থমকে দাঁড়ালো।

তনিমাদি সাবধান করলো 'নো জাম্প নাউ। গেট ইউর এক্স এন্ড রোপ রেডি।'

একে একে কুড়ুলটাকে ছুঁড়ে ফাটলের ওপারে গেঁথে দিতে লাগলো। পরে রোপে লুপ করে সেটাকে কুড়ুলের অপরধারের ভেতরে লাগিয়ে সেই রোপের সাহায্যে লাফিয়ে অনির্বাণ ছাড়া সবাই পেরিয়ে গেলো। ওর কুড়ুলটা নিশানাহত হয়ে একেবারে ক্রিভ্যাসের ভেতরে পড়লো।

ক্ষেম সিং বললো, 'প্রত্যেকের একখানা কুড়ুল ছাড়া এগোনো যাবেনা। আমার কাছে একটাও একস্ট্রা কুড়ুল নেই। অতএব আমি ক্রীভ্যাসে নেমে কুড়ুলটাকে কুড়িয়ে আনি।

সে রোপের সাহায্যে নামতে লাগলো। প্রায় হাজার ফুট নামবার পরই ওর ট্রেক-সুর ডগ লেগে এক চাই বরফ ঝরে পড়লো। একটা ফোকরের সৃষ্টি হলো। এই ফোকরের ভেতর ও দেখতে পেলো মানুষের হাতের কিছু অংশ ও ঐ হাতে ধরে রাখা কুড়ুলের একদিকের ফলাটা।

ক্ষেম সিং-এর বুঝতে দেরী হলো না—কোন মানুষের কোন এক সময় বরফে

সমাধি হয়েছে।

সে আর না নেমে ক্লাইম ব্যাক করে উপরে উঠে এসে টিমকে সব কথা খুলে বললো।

ক্ষেম সিং আরও বললো 'ইয়ে হামারা গাঁওকা সীতা বইন্ কা মর্দানা হোগা।' ও যা হিন্দীতে বললো তার অর্থ হলো, বিশ বছর আগে এই সীতা বহিনীর সংগে গাইড যমুনা সিং-এর বিয়ের কথা হয়েছিলো। বিয়ের আগের দিন যমুনা সিং একদল ট্রেকারদের নিয়ে রওনা হয়েছিলো কিন্তু আর ফিরে আসেনি। সীতা সেই থেকে আর বিয়ে করেনি। ওর মা বাবা কত চেষ্টা করেছিলো কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয়নি।

যমুনা সিং এর একখানা ফটো ওর বাবা সীতার বাপাকে পাঠিয়েছিল। সেই ছবিখানা বাঁধিয়ে রেখে সীতা বহিনী ওর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। বয়সও অনেক হয়েছে। মোটামুটি প্রৌঢ়া বলা চলে।

এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। ঐ শবটাকে খুঁড়ে বার করতে হবে। খুঁড়ে যদি স্নোম্যান, বার হয় তাহলে এক্সপিডিশনের ইতিহাসে একটা বিরাট রেকর্ড সৃষ্টি হবে। লিডার অর্ডার দিল খেম আর রমেশকে। ওরা দুজনে মিলে খুঁড়ে বার করলো একটা তাজা মানুষ। বহু বছর বরফে চাপা থাকায় কোনো বিকৃতি হয়নি। রোপ স্ট্রেচারে করে ক্যাম্বিসের ওপরে তোলা হলো।

সীতা বহিনী খেম সিং-এর বন্ধু লক্ষণ সিং-এর বোন। খেম সিং ওদের বাড়িতে প্রায়ই যেত। ওদের ঘরে যমুনা সিং এর ছবিও দেখেছে; এযে সীতা বহিনীরই সেই মর্দানা তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই খেম সিং-এর।

তনিমাদি সব শুনে বললো, 'আমরা আর ফার্দার প্রসিড করবনা। এই ডেডবডি রোপ স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে গঙ্গোত্রীতে ওর পরিজনদের কাছে নিয়ে যাবো। অতএব অ্যাবাউট টার্ন। চলো গঙ্গোত্রী।'

গঙ্গোত্রীতে পেঁাছে একেবারে সোজা গাইডদের বস্তিতে হাজির; সঙ্গে সেই হিমশীতল যমুনা সিং-এর মৃত দেহ।

বস্তির ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী সকলে সেই নিশ্চল মৃত দেহটাকে হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলো।

সীতা বহিনীকে খবর দেওয়া হলো। তার কিন্তু যমুনা সিংকে চিনতে একটুও দেরী হলো না। বিশ সাল বাদে ওদের দেখা। যমুনা সিং এখনও যুবা

আর সীতা বহিনী আজ প্রৌঢ়া। ঐ মৃত দেহটার উপর পড়ে সে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

অন্বেষণের আটজন সদস্য মাথা নীচু করে নীরবতা পালন করে মৃত দেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো।

(২)

অন্বেষণের ডেপুটি লিডার বিপ্লব চ্যাটার্জী, বয়েস পঁয়তাল্লিশ, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কলকাতায় 'নোভাক এন্ড নোভাক' কোম্পানীর পারচেজ অফিসার। মিশুকে লোক, লম্বা পুরুষালি চেহারা, রং কালোর দিকে। আর ওর একটা বিশেষ পরিচয় উনি তনিমাদির বেটার হাফ। দুজনের বয়সের বিস্তর ফারাক্। তনিমাদি লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ। বিপ্লবদা ও তনিমাদি দুজনেই দিল্লীর প্রবাসী বাঙালী। ওদের ওখানেই সব। চাকরীর সুবাদে ওদের কলকাতা আগমন।

হারিশ পার্কের পাশের গলিতে দাস ঘোষের ফ্ল্যাটটা ওরা ভাড়া নিয়েছেন। কোনো সন্তান নেই। কাজেই দুজনের জন্যে অঢেল জায়গা।

দুর্গাপুজোতে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে তনিমাদি ও বিপ্লবদা হই হই করে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ওদের বসার ঘরে 'অন্বেষণ এক্সপ্লোরার ক্লাবে'র শুরু। তনিমাদি দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পাহাড়ে চড়া শিখেছেন, বিপ্লবদা আবার বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়ে সুইস্ আল্পসে চড়ে অনেক খেতাব পেয়েছেন।

ভবানীপুরের বাধিষ্ণু পাড়ায় এরকম একটা আল্ট্রামডার্ন দম্পতিকে বয়স্করা একটু সন্দেহের চোখেই দেখতেন। নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের মেলা-মেশা পছন্দ করতেন না।

কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো ভীষণ স্বাধীনচেতা, তারা নিজেরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

তনিমাদি এই অল্প সময়ের মধ্যেই গোয়েঙ্কা কলেজ ফর্ গার্লস-এ ইংরেজি অধ্যাপনার একটা পার্টটাইম চাকরী জোগাড় করে ফেলেছেন।

বছরে একবার ওরা এক্সপিডিশন করবেই। খরচা বেশীর ভাগ স্বামী-স্ত্রীর, অল্প কিছু সকলের, আর এই নিয়ে চলছে হিমালয়ের শৃঙ্গ জয়।

তনিমাদির ছেলেমেয়ে নেই। কাজেই প্রতি রবিবার ফাঁকা বাড়িতে চলে পাড়ার ছেলেদের হুল্লোড়।

এবারে থেলুপিক জয়ের বাসনায় সবাই বেরিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু ক্রিভ্যাসে মৃত মানব দেহের আবির্ভাবে থেলু শৃঙ্গ জয় বিঘ্নিত।

সীতা বহিনীর আকুল কান্নায় গঙ্গোত্রীর আকাশ, বাতাস স্পন্দিত। সকলেরই মন খুব আলোড়িত। কিন্তু তনিমাদির মুখ দেখে মনে হচ্ছে উনি যেন বড্ড বেশী ব্যথিত। ঐরকম একটা চপল মেয়ে কেমন যেন নিশ্চুপ নিশ্চল পাথর হয়ে গিয়েছেন।

কিছুক্ষণ বাদে উনি বললেন, 'আমার শরীর ভাল লাগছেনা। আই স্যাল্ গো ব্যাক্ টু হরদুয়ার এ্যান্ড কনসাল্ট এ ডক্টর।'

ওদের গ্রুপের কল্লোলই মেডিকেল কলেজের ফিফথ্ ইয়ারের ছাত্র। ও ব্লাড প্রেসার, পাল্স্ রেস্পিরেশনে কিছু খারাপ পেলো না।

তনিমাদি ওদেরই দলের টুটুনকে নিয়ে রওনা হলেন। টুটুন অলরেডি খুব হোম্সিক্ হয়ে পড়েছিলো। ও এই ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেলো।

এক রাত গঙ্গোত্রী রেস্টহাউসে কাটিয়ে অন্যান্যরা আবার বিপ্লদার নেতৃত্বে থেলুপিকের দিকে রওনা হলো।

শেষ পর্যন্ত বিপ্লবদা ছাড়া আর কেউই থেলুপিকে উঠতে পারলো না। ক্লান্ত তুষার ঝঞ্ঝা জর্জরিত অবস্থায় অবতরণের পালা।

এই অল্টিটিউডে অম্লানের নাক দিয়ে বেশ জোরে রক্ত পড়তে লাগলো। কল্লোলের চেষ্টা ও ওর ইমার্জেন্সি কিট নামক ম্যাজিক বক্স এই অবস্থার সামাল দিলো। এছাড়া সকলেরই নাকের ডগে ও হাত-পায়ের আঙুলে ফ্রস্ট বাইট হয়েছে, তবে কাউকেই বেকায়দায় ফেলতে পারেনি।

অনেক স্মৃতি বুকে ও ক্যামেরায় ধরে ওরা অবশেষে হরিদ্বারের ইউ-পি গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউসে পেঁছিলো। ওখানেই সবার থাকার ব্যবস্থা। বিপ্লবদা অগ্রিম বুকিং করেছিলেন। খবর নিতেই জানা গেল ঐ গেস্ট হাউসেই ৭নং ডরমিটরিতে তনিমাদি ও টুটুল আছে। আমরা সকলে খুব উদ্বেগ নিয়ে ডরমিটরের দরজায় নক্ করতেই টুটুন দরজা খুলে দিল। সকলকে দেখে টুটুন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

'তনিমাদি আমাকে না জানিয়ে কাল সকালে চলে গেছেন। যাবার সময়

একটি চিঠি ও ওনার হাতের সোনার আংটি একটি খামে টেবিল ল্যাম্প ঢাকা দিয়ে রেখে গেছেন। খামের উপর আমার নাম লেখা ছিল—টুটুন চৌধুরী। আমি চিঠিখানা পড়েছি। দাঁড়াও দিচ্ছি।' এই বলে ওর সুটকেশ থেকে একটি খাম ও সোনার আংটি বের করলো।

বিপ্লবদা এতক্ষণে ধপাস করে কার্পেটে বসে পড়লেন। এক গ্লাস জল চাইলেন।

টুটুন বলল, তোমরা না আসা পর্যন্ত আমি পুলিশকে জানাইনি আর হোটেলের কাউকে কিছু বলিনি। বিপ্লবদা একটু সুস্থ হয়ে চিঠি পড়তে শুরু করলেন।

'প্রিয় টুটুন, তুই আমার ভাই-এর মত। তোর ঐ নম্র লাজুক ভাবটাই সবার মধ্যে তোকে আমার কাছে বেশী প্রিয় করে তুলেছে। আজ আমি বড় মন-কষ্টে ভুগছি। মুখফুটে সব কথা কাউকে না বললে আমি মরে যাব। আমি তোর মত ভাইকে সব ব্যথা জানিয়ে দিতে চাই। তুই বিপ্লব ও অন্যান্য সকলকে এই চিঠি দেখাবি। আমি ছোট বেলা থেকেই একটু ফ্র্যাংক ও দুঃসাহসী। আমি কাউকে আমার কথা গোপন করবো না। বিপ্লব আসলে আমার জামাই বাবু। দিদির বিয়ের পর ওর ঐ পাহাড়ে চড়ার উৎসাহটা আমার দুঃসাহসিকতার ইন্ধন জুগিয়েছে। আমি মাউন্টেনীয়ারিং কোর্স পড়েছি ইউনিভার্সিটিতে। ওর সংগে অনেক ছোট ছোট এক্সপিডিশনে গিয়েছি।

আসলে আমার বাবা ছিলেন ফরেন সেক্রেটারী। সেই সুবাদেই আমাদের হোল ফ্যামিলি পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমার জন্মইতো জেনিভাতে। আমি এই জন্যই অতি আধুনিকতার শিকার হয়েছি। আমার দিদি কিন্তু উল্টো। খুব ভদ্র ও নম্র, আর ঘরকুনো। দিদির খালি ভয় বিপ্লবদার পাহাড়ে চড়তে গিয়ে কোনো বিপদ না হয়। দিদি বিয়ের পর থেকে মাসে দু-একবার ছাড়া বিপ্লবদার সংগে বেরোতোই না। ও খালি লিখে চলেছে অজন্তা ইলোরার অজানা ইতিহাস। দিদি ইতিহাসের একজন কৃতী ছাত্রী। ফয়জাবাদ গভর্ণমেন্ট কলেজের ইতিহাসের লেকচারার। আমার একটা বোনঝি হয়েছে। কি সুন্দর দেখতে। বিপ্লব থাকে দিল্লীতে ওর অফিসের হেড কোয়াটারে। অতএব আমি বিপ্লবদাকে চরম ও পরম করে পাবার সুযোগ পেলাম। ট্রেন লেট থাকার জন্য দিদি একদিন ফয়জাবাদ থেকে আমাদের দিল্লীর ফ্ল্যাটে এসে হাজির। কিছুক্ষণ বাদে দিদির আর বুঝতে বাকি

বুঝিনা যে বিপ্লব আর আমি ছিলাম একই শয্যার সঙ্গী। সেই থেকে দিদি আর বিপ্লবের ছাড়াছাড়ি কিন্তু আমার তখন বিপ্লবকে নিবিড় করে পাবার বাসনা পেয়ে বসেছে।

ডিভোর্স হয়নি, তবে আজ চার বছর বিপ্লব আর দিদি সেপারেটেড্‌। ইতিমধ্যে আমাদের বাবা মা মারা গেছেন। বিপ্লব মামার বাড়িতে মানুষ। ও খুব ছোট বেলাতে ওর বাবা মাকে হারিয়েছে। আমি বিপ্লবকে মনেপ্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি।

এই অবস্থায় দিল্লীর সমাজে আর থাকা ভাল মনে করলাম না। তাই বিপ্লব একটা মিউচুয়্যাল ট্র্যান্সফার চাইল কলকাতায়। দিল্লীর কালী বাড়িতে বিপ্লব আমাকে একটা ম্যারেজ রিং পরিয়ে দিয়েছিল। এই সেই আংটি। টুটুন, এটা বিপ্লবকে ফেরৎ দিও।

টুটুন, আমাদের এই খেলু অভিযান আমাকে থেতলে দিয়েছে। বিবেকের দংশনে আমি ক্ষতবিক্ষত। একজন অশিক্ষিতা গাড়োয়াল রমণী আমার মত বিদুষী, আধুনিকাকে চরম শিক্ষা দিলো। আমি সীতা বহিনীর কাছে শিখলাম—জীবনে ভালবাসাই বড় আর বাসনা হচ্ছে সবচেয়ে সর্বনাশা।

আমি শারীরিক বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্যে আমার দিদির ঘর ভেঙেছি। বিপ্লবকে ওর স্ত্রী, কন্যার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি।

আর এদিকে সীতা বহিনী যমুনা সিং-এর বাগ্‌দত্তা হয়েই ওর সমস্ত ভালবাসাকে কেন্দ্রীভূত করেছিলো একমাত্র ভালবাসার মানুষ যমুনা সিং-এর মধ্যেই। ওর মা বাবার শত চেষ্টাতেও ও আর কারো সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারেনি। সীতা সারাজীবন অপেক্ষা করে আছে ঐ যমুনা সিং-এর সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলে।

টুটুন, আজ আমার মনে হচ্ছে শিক্ষা সব সময় মানুষকে মানুষ করেনা। মূর্খতা মানুষকে অমানুষ তো করেইনা, বরং সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের পথ দেখায় মানুষ হবার। আজ খালি ভাবছি পাথরের কোলে বেড়ে-ওঠা সীতা-বহিনীর মনটা কি করে এত কোমল ও পবিত্র হল। আমি বিপ্লবকে অনুরোধ করছি—ও যেন আমার দিদি ও বোনঝির কাছে ফিরে যায়, আরও বলছি তোমরা আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেনা। সকলের অজান্তে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। ভালবাসা নিও, ইতি তনিমাদি।'

বিপ্লবদা কলকাতা থেকে ট্র্যান্সফার হবার পর অন্বেষণ গ্রুপ এখন টিমু টিমু করে চলছে কল্লোলদের বাড়িতে। সাপ্তাহিক আসরে সকল সভ্যদের একটাই অন্বেষণ—তনিমাদি কোথায় ?

ত্রিনয়নী

চাঁদ ওরফে চন্দ্রানী চ্যাটার্জি কলেজের সেরা সুন্দরী। আবার যেমন পড়া-শোনায় তেমান খেলাধুলোতে ওর তুলনা হয় না। ৮০ সালে ইউনিভার্সিটির ব্লু। কিন্তু সেই সুন্দরীর মুখ আজ কদর্য, বিকৃত। দৃষ্টিহীন বাঁ চোখ। এক রাত্রে সে শুয়ে ছিল জানালা খুলে, কে বা কারা ওর মুখে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মেরেছে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও আজও সেই পলাতক আসামীর সন্ধান পায়নি।

জিজ্ঞাসাবাদ ও নানান অনুসন্ধানে জানা গেছে চন্দ্রানীকে দুটি ছেলে ভালবাসতো—একজন বিভাস গুপ্ত, অপর জন অনুপ ব্যানার্জি। দুজনেই ওর সহপাঠী।

বিভাস নিরুদ্দেশ। পুলিশের সন্দেহ বিভাসেরই এই কাজ।

চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি চন্দ্রানীর বাবা সমীরবাবু। ডাক্তারবাবু রায় দিয়েছেন, ভাল প্লাস্টিক সার্জেনকে দিয়ে অপারেশন করালে মুখের বিকৃতি ভাবটা অনেকটা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু দৃষ্টি—হ্যাঁ, ওর বাঁ চোখের মণিটা এ্যাসিডে পুড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে কর্ণিয়া গ্রাফটিং করালে, মানে অপর কোন মৃত ব্যক্তির স্বচ্ছ মণি ওর চোখে বসাতে পারলে চন্দ্রাণী আবার ওর বাঁ চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে।

২

সমীরবাবু ভীষণ চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না, কারণ মা মরা চন্দ্রানী তাঁর বড় আদরের একমাত্র মেয়ে। সমীর বাবুর একমাত্র ছেলে অশোক। অশোক মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের লেকচারার। অবিবাহিত। ছোটবোনের এই খবর শুনে কোলকাতায় লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছে। অশোক প্রস্তাব দিল, 'বাবা ইন্দোরে আমার বড় কোয়ার্টার এবং ওখানে বড় বড় ডাক্তার আছে। চল আমরা চন্দ্রানীকে নিয়ে ইন্দোর যাই।

কারণ আমার নতুন চাকরী, বারে বারে ছুটি নিয়ে আমার পক্ষে কোলকাতায় আসা সম্ভব নয়।'

সমীরবাবু ছেলের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। অফিসে ছুটির দরখাস্ত করলেন। ইন্দোর যাবার প্রস্তুতি পর্ব চলতে লাগলো।

বম্বে মেলের টিকিট কাটা হলো। শেষে একদিন রওনাও হলো সকলে। খাণ্ডোয়া জংশনে নেমে আর একটি ট্রেনে যেতে হবে ইন্দোর। সকাল নয়টা নাগাদ ইন্দোর পেঁছে অটোতে করে অশোকের কোয়ার্টারে।

পরের দিন চন্দ্রানীকে নিয়ে গেল চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধান্ডার কাছে। তিনি খুবই সহানুভূতির সংগে চন্দ্রাণীকে পরীক্ষা করলেন। ডাঃ ধান্ডা বললেন যে, কার্ণিয়া গ্রাফটিং করা যাবে এবং চন্দ্রাণী ওর দৃষ্টি ফিরে পাবে। চন্দ্রাণীকে ভর্তি করার জন্য ডাঃ ধান্ডা চৈতরাম হাসপাতালের আর. এম. ওকে চিঠি লিখে দিলেন। সেই সংগে বম্বে চক্ষু ব্যাংককে একটি চোখের জন্যে ট্রাংকল করলেন। ডাঃ ধান্ডা অবশ্য অশোককে বললেন, 'চক্ষু ব্যাংক থেকে চোখ পেতে কয়েকদিন হয়তো দেরী হতে পারে। প্রত্যেকদিন সকালে অপারেশনের জন্য না খেয়ে থাকতে হবে। যেদিন চোখ পাওয়া যাবে সেদিনই অজ্ঞান করে অপারেশন করা হবে। মুখের প্ল্যাস্টিক্ সার্জারির ব্যাপারটা পরে ভাবা যাবে। চোখের ব্যাপারটা জরুরী তাই এটা প্রথমেই করতে হবে।'

চৈতরাম হাসপাতালটি বড় সুন্দর, অপূর্ব পরিবেশ। ইন্দোর শহর থেকে কিছু দূরে এন. এইচ. তিন-এর ধারে। চন্দ্রাণীকে ভর্তি করে দিয়ে অশোক ফিরে গেল। হাসপাতালের মধ্যেই রোগীর আত্মীয়দের থাকার জন্য দৈনিক দশটাকা করে যে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, সমীরবাবু মেয়ের দেখাশোনার জন্যে সেখানেই থেকে গেলেন।

চললো চক্ষু ব্যাংকের চোখের জন্য প্রতীক্ষা। একদিন, দুদিন, দশদিন হয়ে গেলো তবুও চোখ আর পাওয়া যায় না। পনের দিন অতিক্রান্ত। হঠাৎ সকাল দশটা নাগাদ সিস্টার এসে বললো, 'চোখ পাওয়া গেছে। রোগীকে অপা-রেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। আজই অপারেশন হবে।'

সমীরবাবু ও অশোক গভীর উৎকণ্ঠায় অপারেশন থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘন্টা দুই বাদে চন্দ্রানীকে অচৈতন্য অবস্থায় ওয়ার্ডে নিয়ে

আসা হলো। ডাক্তার বাবু বললেন, 'অপারেশন খুব ভাল ভাবে হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন চিন্তা নেই।'

চন্দ্রানীর দু চোখ ব্যান্ডেজ করা। দু দিন থাকবে এই ব্যান্ডেজ, তারপর ভাল চোখটা খুলে দেওয়া হবে। তিনদিন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। মাথাও নাড়া যাবে না। বাথরুম যাওয়া নিষিদ্ধ।

রোজই ডাঃ ধান্ডা চোখ ড্রেস করে আবার ব্যান্ডেজ করে দিতেন। সংগে চলতে লাগলো ওষুধ পত্র। ছ' দিন বাদে ভাল চোখ খুলে দেওয়া হলো। চন্দ্রানী অন্ধত্ব থেকে পূর্ণ মুক্তি পেল। ক্রমশ সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। অপারেশন করা চোখে দেখতে পাচ্ছে। তবে ডাঃ ধান্ডা বললেন, 'এক মাসের বেশী থাকতে হবে। যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছেন আমি ততদিন ছাড়বো না।'

৪

অপারেশনের পর বারদিন। চন্দ্রানী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তার সাধারণ খাবার খেতে বলেছেন। দুধ ও ফলের বন্দোবস্তও আছে। সমীরবাবু ও অশোক চন্দ্রানীর জন্যে কোন ত্রুটি রাখেনি। হাসপাতালের খরচ প্রচুর। কিন্তু ও'রা টাকা পয়সার কথা একেবারেই চিন্তা করছেন না।

সেদিনটা বোধ হয় শুক্রবার। সকাল দশটা নাগাদ হাসপাতালের সুপারিন-টেন্ডেন্ট ডাঃ ইডনানী সিস্টারকে দিয়ে জরুরী খবর পাঠিয়েছেন যে ১০৩নং কেবিনের রোগী চন্দ্রানীর বাবা বা কোন অভিভাবক যেন তাঁর সংগে অবশ্যই দেখা করেন। সমীরবাবু তখন কেবিনেই ছিলেন। সংগে সংগে তিনি ডাঃ ইডনানীর ঘরে ছুটলেন। ঘরে ঢুকেই সমীরবাবু অবাক। সেখানে বসে আছেন একজন পুলিশ ইনসপেক্টার এবং দুজন কনস্টেবল।

ডাঃ ইডনানী সমীরবাবুকে বসতে বললেন এবং পুলিশ অফিসারের সংগে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনিই ১০৩ নং কেবিনের রোগীর অভিবাবক। আপনার যা জিজ্ঞাস্য তা জিজ্ঞেস করুন।

পুলিশ অফিসার বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন, চন্দ্রানী ব্যানার্জি কি আপনার মেয়ে ?'

সমীরবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

পুলিশ অফিসার আবার আরম্ভ করলেন, 'আপনার মেয়ের নামে একখানা চিঠি আছে। লিখেছে বিভাস গুপ্ত। আপনি চিঠিখানা পড়ুন।'

সমীরবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

"—প্রিয় চন্দ্রানী,

তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমিই সেই শয়তান যে তোমার আজকের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। আমি তোমাকে ভালবাসতাম। হ্যাঁ, প্রাণ দিয়েও ভালবাসতাম। তোমাকে আমি একদিন বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আমার বাবার অবস্থা ভাল। আমার চাকরী না করলেও চলবে। বাবা একজন বড় কনট্রাকটর। কোনদিন তোমার অভাব হবে না। কিন্তু তুমি আমাকে মোটেই পছন্দ করতে না। তুমি গরীবের ছেলে অনুপকেই ভালবাসতে। কারণ বোধহয় ও ক্লাসের সেরা ছেলে। পড়াশুনা, দেখতে শুনতে সর্বদিক থেকেই সে ভালো। যেদিন আমি বুঝতে পারলাম তুমি অনুপকেই বিয়ে করবে, সেদিন থেকে আমি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগলাম। ভালবাসা যে মানুষকে অমানুষ করে তোলে তা বুঝতে আমার দেরী হল না। একদিন আমিই জানলা দিয়ে তোমার মুখে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারি। আমার মনে শুধু এইটুকু ছিল যে আমার প্রেমিকাকে আমি অপরের হাতে তুলে দিতে পারব না। তাই সে পথ আমি বন্ধ করে দিলাম। তারপর দিন থেকে আমি পলাতক। পলাতক হলাম বললে ভুল হবে, গা ঢাকা দিলাম এবং গোপনে সব খবরই রাখতে লাগলাম। তোমাদের ইন্দোরে যাবার খবর পেলাম। ভালই হোলো। আমার পিসে মশায় ইন্দোরে কাস্টমস্ অফিসার। তোমাদের ইন্দোর যাবার কয়েকদিন পর আমি পিসে মশায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির। কোলকাতার কোন খবর বাবা কোন আত্মীয়-স্বজনদের জানান নি, তাই আমি হঠাৎ যাওয়াতে পিসীমা ও পিসে মশায়র কি আনন্দ! যত্নের সীমা নেই। কিন্তু আমার অনুসন্ধান চলতে লাগলো তোমাকে ঘিরে। জানতে পারলাম তুমি চৈতরাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছো। গোপনে আমি হাসপাতালের রিসেপশন কাউন্টারে তোমার সব খবরই রাখতে লাগলাম। জানলাম তোমার কর্ণিয়া গ্রাফটিং হবে। চোখটা আসবে বম্বে চক্ষু ব্যাঙ্ক থেকে। কিন্তু অনেকদিন চোখ পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমার ওই দুর্ঘটনার পর থেকে ভীষণ অনুতপ্ত। সব সময়ই আমি চেয়েছি তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো। আমি মনে মনে ভাবলাম একটা চোখের জন্য তোমার চোখ অপারেশন হবে না, তুমি দৃষ্টি ফিরে পাবে না, এ আমি হতে দেবনা।

'একদিন পিসীমাকে না বলেই আমি বম্বে চলে গেলাম এবং ওখানকার চক্ষু ব্যাংকে গিয়ে চক্ষু দানের অংগীকার পত্রে সই করলাম। আমি বম্বে হোটেলের ৪নং ঘরে উঠেছিলাম। মনে মনে আমি আত্মহননের কথা চিন্তা করি, যাতে করে আমার মৃত্যুর পর আমার চোখ তোমার দৃষ্টি ফিরে দেয়। তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরে পেলে শুধু এইটুকু তুমি মনে রেখো—আমি তোমার চোখের মণিতে বেঁচে আছি। আর তোমার সংগে আমার কোনদিন দেখা হবে না। তুমি সুখী হও। অনুপকে তুমি বিয়ে করো। আমি তোমাদের পথ থেকে সরে যাচ্ছি।

ইতি—বিভাস"

সমীরবাবু চিঠিখানা পড়ে বাকরুদ্ধ। ডাঃ ইডনানী বললেন রোগীকে, 'এখন এসব কথা বলবেন না। উনি ছাড়া পেলে বলবেন। এখন এসব খবর জানলে রোগী মানসিক আঘাত পাবে এবং তাতে অপারেশন খারাপ হয়ে যাবে।'

পুলিশ অফিসার সমীরবাবুর কাছ থেকে সেই দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ লিখে নিলেন এবং বললেন, 'পরে প্রয়োজন হলে ওর সংগে যোগাযোগ করবেন। তিনি আরো বললেন যে একটি যুবক দাদার স্টেশনের কাছে রেললাইনে আত্মহত্যা করে। তার পকেট থেকে এই চিঠি এবং চক্ষু ব্যাংকের চক্ষুদানের অংগীকার পত্রের একটি কাউন্টার পার্ট পাওয়া যায়। মৃতদেহ মর্গে নিয়ে গিয়ে আমরা চক্ষু ব্যাংকের সংগে যোগাযোগ করি এবং ওর চক্ষুটি নিয়ে নেন। পরে ওই ছেলেটির পকেটে পাওয়া যায় একটি ডায়ারি। তাতে ছিল ওর পিসেমশায়ের ঠিকানা। আমরা ওকে খবর দিই এবং পোস্টমর্টম করে মৃতদেহ দিয়ে দিই। বিভাসের পিসেমশায় ওই আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে আমাদের অনুরোধ করেন। আমরা সেইজন্যেই এখানে এসেছি।'

পুলিশ অফিসার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সমীরবাবু চন্দ্রানীকে ঘুণাক্ষরেও এইসব ব্যাপার জানতে দিলেন না। অশোককে সব কথা বললেন।

একমাস এগারো দিন বাদে চন্দ্রানী সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠলো। ডাঃ পরাশর ওই চৈতরাম হাসপাতালের প্ল্যাস্টিক সার্জেন। তিনি এবার ওর বিকৃত মুখের অপারেশন করলেন এবং মোট তিনমাস চারদিন বাদে চন্দ্রানী ছাড়া পেলো। চন্দ্রানীকে দেখে এখন কেউ ভাবতেই পারবে না যে ওর এইরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। সে আগের মত সুন্দর হয়েছে এবং নিজের দুচোখ ও বিভাসের একটি চোখ নিয়ে সে হয়েছে ত্রিনয়নী তন্বী।

——

সহানুভূতি

মিঃ চিরঞ্জীত চ্যাটার্জী চেম্বার থেকে বেরোবার আগে বললো,' ইওর বিহেভিয়ার ইজ ইওর অ্যাসেট, আপনার ব্যবহারই আপনার মূলধন।'

এই সুন্দর কমপ্লিমেন্টটা ডাঃ প্রশান্ত ভৌমিকের মনে একটা কোমল প্রশান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিলো।

মিঃ চ্যাটার্জী ওর বাবাকে ডাঃ ভৌমিকের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। পরীক্ষায় ধরা পড়লো গলায় ক্যান্সার হয়েছে। ডাঃ ভৌমিক মিঃ চ্যাটার্জীকে মন শক্ত করতে বললেন।

'এখন পর্যন্ত এই রোগের যা চিকিৎসা বেরিয়েছে তাতে আয়ুটাকে কিছুদিনের জন্যে ধরে রাখা যায় মাত্র। খুব প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে অবশ্য অন্য কথা। তবুতো চেষ্টা করতেই হবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

কথাগুলো একটু সহানুভূতির সঙ্গে ডাঃ ভৌমিকের মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং শিক্ষক ডাঃ মিহির দত্তের সেই মেডিসিন ক্লাশের কথাগুলো প্রায়ই ডাঃ ভৌমিকের কানে বাজে ঃ —এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ডু নট ম্যাটার, ইট ইজ সিমপ্যাথি হোয়াট মাটারস্।

রোগীর চিকিৎসার জন্যে চাই সহানুভূতি।

এই সূত্রে ডাঃ ভৌমিকের মানে প্রশান্তর মনে পড়ে গেল ওর পুরনো দিনের অনেক কথা।

মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সী অবজারভেশন ওয়ার্ডে হাউস সার্জন হয়ে প্রথম শিক্ষানবিশী শুরু করলো এই প্রশান্ত। রোজই সকাল আটটার সময় একটা স্কুটারে করে এক বিদেশী পাদ্রী আসতেন। ওয়ার্ডে ঢুকে উনি প্রত্যেকটি রোগীর বেডের কাছে যেতেন। এক হাত রোগীর মাথায় দিয়ে এবং আর এক হাতে বাইবেলখানা ধরে বিড়বিড় করে আওড়ে যেতেন। রোগীরা বাইবেলের কোন কথা বুঝতো কিনা বলা যায়না, কিন্তু সব রোগী হাত জোড় করে তাদের রোগাতুর মুখগুলোতে ক্ষীণ আনন্দের ছবি এঁকে ঐ পাদ্রী সাহেবকে বিদায় জানাতো।

পাদ্রী সাহেবের হাতের স্পর্শে কোন মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অমর হতো না ঠিকই তবে প্রশান্তর মনে হতো,—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে নিশ্চয় রোগীটির মনে হয়েছে যে এই পৃথিবী তাকে ভালবেসে হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছে।

প্রাশান্তর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। মাদার টেরেসার নির্মলহৃদয় হোমে একবার এক সাংবাদিক গিয়ে উপাস্থত হলেন। মাদার ঐ সময় এক অতীব বৃদ্ধা পঙ্গুকে স্নান করাচ্ছিলেন। এরপর তিনি নিজের হাতে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটু ডাল ভাত মেখে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। বৃদ্ধার একেবারে শেষ অবস্থা! খাবারের বেশীর ভাগই মুখের বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

সাংবাদিক মাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাদার, এই বৃদ্ধা বোধ হয় বেশীক্ষণ আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না, অতএব এই যত্ন বোধ হয় বিফল হবে।'

মাদার বলে উঠলেন, 'আই নো সি উইল ডাই সুন। বাট আই ওয়ান্ট দ্যাট শী সুড ডাই উইথ ডিগনিটি।'

এই ঘটনা প্রশান্তর মনে ভীষণ ভাবে দাগ কেটেছিলো। ওই কথাগুলো বলে মাদার টেরেসা মৃত্যুপথযাত্রীদের প্রতি কী গভীর সম্মান জানিয়েছেন। প্রশান্ত ভাবতে থাকে —আমরা সব রোগীকে সারাতে পারিনা। কোথায় যেন আমাদের ডাক্তারীবিদ্যে শেষ হয়ে যায়। তখন তো সেই সনাতন কথা বলেই আমরা খালাস—'দাবামে যো না হুয়া দুয়ামে সো হোগা।'

আজকাল হাসপাতালগুলোতে যখন তখন একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। এর কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে। মানসিক দিক থেকে হয়ে পড়েছে একটু বেশী স্পর্শকাতর।

যখন কোন রোগীকে তার আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন তখন তাঁরা চান তাঁদের রোগীকে একটু চটজলদি এবং সহানুভূতির সঙ্গে ডাক্তাররা দেখুক। হাসপাতালের প্রচুর ভীড় এবং ডাক্তার ও সেবিকার অপ্রতুল আয়োজনের জন্যে যদি রোগীর প্রতি সামান্যতম আন্তরিকতার অভাব ঘটে তবেই শুরু হয়ে গেল গোলমাল।

যে সমস্ত চিকিৎসক একটু হৃদয়বান হন তাঁরা খুব সহজেই রোগীদের প্রিয়পাত্র হন। মনে হয় চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সহানুভূতিশাস্ত্র যদি ডাক্তাররা

পারদর্শী হন তবে খুবই সুফল ফলবে। তবে কথা হলো সহানুভূতি জিনিষটা মানুষের মনের একটা কোমল প্রবৃত্তি এবং এর জন্ম হবে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সুস্থ পরিবেশ থেকে। এই পরিবেশের অভাব ঘটলে এই সহানুভূতি নামক বস্তুটির অস্তিত্ব ডাক্তারদের মনে ধরে রাখা শক্ত হবে।

ভুললে চলবে না চিকিৎসকরাও এই সমাজের একজন সদস্য। অতএব অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ ওদের মনের সুকুমার বৃত্তিকে নষ্ট করতে বাধ্য।

সত্যিকথা বলতে কি শুধু চিকিৎসক নয়, সমাজের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে ভালবাসা কাউকে দিলে তবেই তার ভালবাসা পাওয়া যায়। আমি যদি কাউকে সম্মান দেখাই তবেই সে আমাকে সম্মান দেখাবে, নচেৎ নয়।

তবে একথাও ঠিক এই অসুস্থ পরিবেশেও সামান্য কিছুসংখ্যক সহানুভূতিশীল ও হৃদয়বান লোক সমাজে রয়েছেন এবং তাঁরা তাই সকলের নমস্য।

যেদিন সমাজের সকলেই সহানুভূতিশীল বলে পরিচিত হবেন সেই দিনই প্রতিষ্ঠিত হবে রামরাজ্য। আমরা সেই দিনটার আশায় বসে রইলাম।

টিউলিপ ফুল

সকালে ঘুম থেকে উঠে দিলীপ চৌধুরী বেড-টি খেতে খেতে খবরের কাগজখানা হাতে নিল। কাগজখানা খুলেই দেখলো ফ্রন্টপেজের হেডলাইন। 'রুডলফ হেস কারাগারে প্রাণত্যাগ করেছেন।' হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহচর ওর বিরাট জীবনের সিংহভাগই কাটিয়ে দিলেন কারাগারে।

এই প্রসঙ্গে মেরিন ইঞ্জিনীয়ার দিলীপের মনে পড়ে গেল ওরই জার্মান বন্ধু রুডলফ হেলবিগের কথা। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দিলীপের আলাপ সেই উনিশশো ষাট সালে। পশ্চিম জার্মানীর ওয়েসার নদীর ধারে ব্রেমেন বন্দর। ইন্ডিয়ান স্টীমশিপ কোম্পানির মালবাহী জাহাজ 'ইন্ডিয়ান রিলায়েন্স' এসে ঠেকেছে এই বন্দরে। এবারে ও সপরিবারে পাড়ি দিয়েছে। ছেলে মাংগু আর মেয়ে পিকু খুবই আনন্দে আছে বাবা-মার সঙ্গে থাকতে পেয়ে।

ডিসেম্বরের ভোর বেলা। কুয়াশাটা ফিকে হয়ে এসেছে। জাহাজের কেবিনে পোর্টহোল দিয়ে মাংগু আর পিকু চোখ মেলে দেখছে ব্রেমেন পোর্টের বড় বড় ক্রেনগুলোকে। মাংগু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাবা বাবা, দেখ একটা লোকের সঙ্গে তিনটে কি সুন্দর সুন্দর ছোট মেয়ে আসছে।'

দিলীপ কেবিনের জানলা দিয়ে দেখলো এক জার্মানী ভদ্রলোক ক্রাচে হাঁটছেন আর ওর পাশে তিনটি ছোট মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। দিলীপ পোর্টহোল থেকে বলে উঠলো, 'গুটেন মরগেন',—মানে হোল সুপ্রভাত।

এরপর ভদ্রলোক এবং বাচ্চা মেয়ে তিনটি একসঙ্গে বলে উঠলো, 'গুটেন মরগেন।'

দিলীপ তাড়াতাড়ি জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে পোর্টে নেমে গিয়ে কন্যাসন্তান সহ ভদ্রলোকটিকে জাহাজের কেবিনে নিয়ে এলো।

হাতের ক্রাচ কেবিনের একপাশের দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে ভদ্রলোক সোফাতে বসলেন। নিজের পরিচয় দিলেন : 'আমার নাম রুডলফ হেলবিগ। আমি এক জন শিক্ষক। আমি ইংরাজী ভাষায় ডক্টরেট। এই তিনটি আমার মেয়ে। এ হচ্ছে গিজলা, এর নাম এরিকা আর এ আমার উলরিকা।'

মেয়ে তিনটির বয়স সাত, পাঁচ আর তিন। পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে

তিনটি ওদের ফ্রকের নীচের অংশ দুহাতে ধরে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো দিলীপদের সকলকে।

দিলীপ সংগে সংগে মেয়ে তিনটিকে ব্ল্যাকম্যাজিক চকোলেট দিলো। চকোলেটের মোড়কটি খুলে মুখে পুরে দিলো মেয়েগুলি। দিলীপ লক্ষ্য করছিলো মেয়ে তিনটি চকোলেটের র‍্যাপারগুলো কোথাও না ফেলে হাতে করে কিছুক্ষণ রাখলো তারপর ওগুলো ওদের বাবার কোটের পকেটে পুরে দিলো।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করার পর ডাঃ হেলবিগ ওদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার অনুরোধ করলো। উনি ঠিকানা দিলেন, 'আমাদের বাড়ি ব্রেমেনের হারম্যান্সবুর্গে। কাল রবিবার আমাদের ছুটি। আমরা সকলে বাড়ি থাকবো। দুপুরে আপনারা চলে আসুন। ওখানেই আপনারা লাঞ্চ খাবেন। আজ তাহলে উঠি। বিটেজেন, আই মিন গুডবাই।'

দিলীপ রবিবারের একটা ছুটি ম্যানেজ করলো সেকেন্ড ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বনাথ হাটুয়ার সংগে আলোচনা করে। দিলীপের স্ত্রী আরতি সকাল দশটার মধ্যে ছেলেমেয়েদের রেডি করে ফেললো। বেলা এগারোটা নাগাদ রওনা হলো একটা ট্যাক্সি করে। রাস্তায় একটা ফুলের দোকানে ট্যাক্সি থামিয়ে একগোছা টিউলিপ ফুল কিনলো দিলীপ। কুড়ি মার্ক ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ওরা পৌঁছুলো ডাঃ হেলবিগের বাড়ি।

ছোট একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগানে দুটো ন্যাসপাতির গাছ। একতলার ঘর এখন বন্ধ। একতলার দরজার সামনে স্তূপাকার বরফ জমে থাকার জন্যে দরজা খোলা যাচ্ছে না। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরের দরজায় লাগান কলিংবেল টিপতেই ডাঃ হেলবিগ দরজা খুললেন। মিসেস হেলবিগ তাড়াতাড়ি এসে মিসেস চৌধুরীর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ড্রইংরুমে বসলো সবাই।

সব ফার্ণিচার কাঠের। সুন্দর সাজানো। দিলীপের টিউলিপ ফুলগুলো মিসেস হেলবিগ ফ্লাওয়ার ভাসে সাজাতে সাজাতে বললেন, 'মিঃ এন্ড মিসেস চৌধুরী, আমার মেয়েরা আপনাদের কত প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে বৃটিশ চকোলেট ব্লাকম্যাজিকের কথা আর ভুলতে পারছে না।' গিজলা আর উলরিকা মাংগু ও পিকুকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে টি-ভির সামনে বসালো। এরিকা সুইচটা অন করতেই বাচ্চাদের একটা প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বাচ্চারা চিজ্‌

খেতে খেতে টি-ভি দেখতে লাগলো।

দিলীপ কফি আর চিজ্ খেতে খেতে ডঃ হেলবিগের সংগে গল্প মেতে উঠলো। মিসেস হেলবিগ মিসেস চৌধুরীকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে রান্না আর গল্প করতে শুরু করে দিলেন।

মিঃ হেলবিগ শুরু করলেন, 'জানেন মিঃ চৌধুরী, ডানকার্কের যুদ্ধে আমি ছিলাম জার্মান সেনা বাহিনীর একজন সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে একটা বুলেট এসে লাগলো আমার এই বাঁ পায়ের হাঁটুতে। এরপরেই আমি ওয়ার প্রিজনার হয়ে গেলাম। প্রিজনারস ক্যাম্প হসপিটালে আমার হাঁটু থেকে বুলেট বের করা হলো। সেই থেকে ক্রাচের সাহায্যে চলতে হচ্ছে। প্রিজনারস ক্যাম্পে জার্মান বন্দীদের কথা বোঝাবার জন্য ইংরাজীর ইন্টারপ্রেটার হিসেবে কাজ করাতো ওরা।

জানেন মিস্টার চৌধুরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে প্রায় সারা পৃথিবীটা একজোটে লড়াই করেছে। আমরা হেরে গেছি তাই আমাদের দুর্নাম আর দুর্দশার অন্ত নেই। আমাদের দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ঐতিহ্যময় বার্লিন শহরকে ওয়াল দিয়ে দুটুকরো করা হয়েছে। আমার বাবা মা এবং এক ভাই পূর্ব জার্মানীতে থেকে গেছেন। ঊনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে যুদ্ধ মেটার পর দেশের সে কি অবস্থা! চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ আর হাহাকার। এই অবস্থাতে আমরা যারা বেঁচে রইলাম, সকলে জোট বেঁধে বাঁচার লড়াইয়ে নেমে পড়লাম। যুদ্ধে বহুলোকের প্রাণহানিতে লোকসংখ্যা ভীষণভাবে কমে গিয়েছে। দেশে শুরু হয়েছে কর্মযজ্ঞ। কিন্তু এই বৃহৎ কাজের জন্যে চাই বহু লোকজন। টেকনিশিয়ান, লেবারের বড় প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশ গ্রীস, টার্কী, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল থেকে আমদানী করলো লক্ষ লক্ষ লোক। ওদেরকে সিটি-জেনশিপ দেওয়া হলো। কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা পশ্চিম জার্মানীর চেহারাটা প্রায় বদলে ফেললাম। ডয়েস মার্কের দাম বাড়তে লাগলো। এই ক'বছরে ডয়েস মার্কের দু বার রিভ্যালুয়েশন হয়েছে। তবে এর জন্যে আমরা একটা বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি। আজকে জার্মানীতে সত্যিকার জার্মান রক্তের লোক কমে গিয়েছে। বহিরাগতদের ভিড় বেড়েছে। হিটলারের সেই স্বপ্ন 'জার্মানী ফর জার্মানস্' আজ একেবারে ভেংগে চুরমার হয়ে গিয়েছে।'

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। খাবার টেবিল সাজান হয়েছে। মিসেস হেলবিগ সকলকে খেতে ডাকলেন।

প্রথম পর্বে লেন্টিল স্যুপ বেশ ভালই খেতে লাগলো। দ্বিতীয় পর্বে গলা ভাত, আলু সেদ্ধ, মুরগী সেদ্ধ। সব খাবারই মশলাবিহীন কিন্তু সুস্বাদু। শেষপর্বে এলো একখানা করে জায়েন্ট আইসক্রীম। এটাকে থিয়েটায়ার আইসক্রীম বলাই ঠিক হবে। নানারকম ফলের টুকরো এবং প্রচুর ক্রীম দিয়ে তৈরী।

বিদায় পর্বে ডঃ হেলবিগ দিলীপের হাওড়া শিবপুরের ঠিকানাটা নিতে ভুললেন না।

সেই থেকে প্রত্যেক নববর্ষে ডঃ হেলবিগের একখানা করে গ্রিটিংস্ কার্ড আসতে লাগলো দিলীপের শিবপুরের বাড়িতে।

ঊনিশশো আশি সালে আবার একবার ব্রেমেন বন্দরে জাহাজ এলো। দিলীপ একদিন পোর্ট থেকে টেলিফোন করলো ডঃ হেলবিগের বাড়িতে। টেলিফোনে অনেক কথাই হোলো। ডঃ হেলবিগ বললেন, 'আজ তিনবছর হলো আমি রিটায়ার করেছি। বড়মেয়ে গিজলা ডাক্তার হয়েছে, পিডিয়াট্রিক সার্জন। বিয়ে হয়েছে একজন ডাক্তারের সঙ্গে। মেজ মেয়ে এরিকা জার্মান ল্যাংগুয়েজে এম এ পাশ করে একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়েছে। ছোট মেয়ে উলরিকা পশু-চিকিৎসক হয়ে ব্রেমেন পিগারির ইনচার্জ। মেয়েরা সকলেই যে যার কর্মস্থলে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়িতে এখন আমি আর মিসেস হেলবিগ থাকি। কাল তোমার সঙ্গে আমি সকাল দশটায় দেখা করবো।'

পরদিন সকালে একটা ট্যাক্সি করে ডঃ হেলবিগ ওনার ছোটমেয়ে উলরিকার পিগারি দেখাতে নিয়ে গেলেন। জানুয়ারী মাসে এত বরফ পড়েছে ব্রেমেনের রাস্তায় তা বলে বুঝানো যাবে না। বালি আর নুন ছিটিয়ে বরফকে গলিয়ে বুলডেজার দিয়ে রাস্তা সাফ হচ্ছে। মাঝে মধ্যে স্নো ফল হচ্ছে। এরই মধ্যে ওরা পিগারীতে পৌঁছলো।

প্রথমটা উলরিকা দিলীপকে চিনতে পারেনি। ডঃ হেলবিগ একটু বলতেই খাতির করে ওদের দুজনকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। কফি আর বিস্কুট খাওয়াল। পুরো পিগারিটা ঘুরিয়ে দেখাল। এক একটা শুয়োর যেন আমাদের দেশী গরুর মত।

ডঃ হেলবিগ এর পর দিলীপকে নিয়ে গেলেন ওর বাড়িতে। ওর বাড়ির বাগানের ন্যাসপাতির গাছের পাতায় বরফ জমে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। মিসেস হেলবিগ দরজা খুললেন। তিনি যেন একটু স্থবির হয়ে গেছেন। ধীর পদক্ষেপে কিচেন থেকে কফি নিয়ে এলেন।

কফি খেতে খেতে দিলীপের একটা কথাই মনে হচ্ছিলো—বৃদ্ধ হওয়াটাই এইসব সভ্য দেশের একটা বিড়ম্বনা। ছেলে মেয়েরা মানুষ হবার সংগে সংগে সবাই যে যার বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। নিঃসংগতাকে সংগী করে ঘরে বসে থাকে শুধু ঐ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের দল।

কফি খেয়ে দিলীপ বললো, 'আমি এবার উঠবো।' ডঃ হেলবিগ এবং মিসেস হেলবিগ একসংগে বলে উঠলেন, 'আরও একটু বসুন মিঃ চৌধুরী।'

হেলবিগ দম্পতির এই অনুরোধ দিলীপ এড়াতে পারলো না। দিলীপের বুঝতে দেরী হলো না যে ওরা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ওদের নিঃসংগতাটাকে একটু ভুলতে চায়।

ডঃ হেলবিগ শুরু করলেন, 'মিঃ চৌধুরী, তুমি তোমার বন্ধুর হাতে আমাকে টেগোরের গানের ক্যাসেট এবং গীতাঞ্জলি বইটা পাঠিয়েছিলে। সে গুলোকে খুব যত্ন করে রেখেছি। আমার চাকুরী জীবন যেদিন শেষ হলো সেই ফেয়ারওয়েলের দিনে আমি টেগোরের ঐ বিখ্যাত কবিতার বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একটা লেকচার দিয়েছিলাম। সবাই খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলো। একটু দাঁড়ান।'

উনি ওনার আলমারী থেকে কিছু ক্যাসেট আর টেপ রেকর্ডারটা বার করলেন। একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিলেন, বাজতে লাগলো সেই বিখ্যাত গানখানা :

'তোরা কে যাবি পারে
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে—'

ডঃ হেলবিগ বলতে থাকেন, 'তুমি গানের ক্যাসেটের সংগে সব গানগুলোর কথা ইংরাজীতে লিখে পাঠিয়েছিলে। এতে আমার খুব সুবিধে হয়েছিলো বুঝতে, সব গানের মধ্যে আমার এই গানটা বড় পছন্দ। যখন কেউ কোথাও থাকে না তখন এই গান শুনতে শুনতে আমি কি রকম যেন হয়ে যাই। মনে জোর পাই।

ইদানিং প্রায়ই আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। শরীর খারাপ হলেই যখনই মনটা বড় অশান্ত হয়ে ওঠে, তখনই আমি টেগোরের গীতাঞ্জলির সেই কবিতাটা পড়ি 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান', উনি ডেথকে ভগবানের সংগে তুলনা করেছেন। মৃত্যু হয় যখন তখনই মানুষ ভগবানের সংগ পায়। কি বিরাট কনশেপশন। মৃত্যুপথযাত্রীদের পক্ষে এটা যে কত বড় সান্ত্বনা তা ভাবা যায় না।'

ডঃ হেলবিগের কথাগুলো দিলীপ চৌধুরীর মনের কোনে একটা আবেগের উদ্রেক করে। ও আর বসে থাকতে পারে না। 'বিটেজেন' মানে বিদায় বলে উঠে পড়ে।

উনিশশো ছিয়াশীর ডিসেম্বরে আবার একবার দিলীপের জাহাজ ব্রেমেনে এলো। একটা রবিবারের সকালে মিঃ হেলবিগের বাড়িতে জাহাজের টেলিফোন বুথ থেকে রিং করলো। মিসেস হেলবিগ দিলীপকে সকাল দশটায় আসতে বললেন।

ঠিক দশটায় দিলীপ পেঁছে ডঃ হেলবিগের খোঁজ করলো। মিসেস হেলবিগ বললেন, 'ডঃ হেলবিগ বাড়ি নেই। উনি ওয়েস্‌টস ট্রাসেতে গেছেন। চলুন আমারা ওখানে গিয়ে ওর সংগে দেখা করবো।'

ওয়েস্‌টস ট্রাসে নামটা শুনে দিলীপ চমকে উঠলো। মিঃ হেলবিগ ওখানকার কবরখানায় ওকে প্রায় পাঁচিশ বছর আগে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ওয়েস্‌টস ট্রাসে পেঁছে ওখানকার সমাধিস্থলের গেটের কাছে মিসেস হেলবিগ টেক্সিকে থামতে বললেন। টেক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন মিসেস হেলবিগ। উনি সেমেটারির গেটের কাছে ফুলের দোকান থেকে একবাণ্ড টিউলিপ ফুল কিনলেন। দিলীপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ চৌধুরী আপনি ফুল নেবেন না?'

দিলীপ একটা অজানা আশংকায় কম্পিত হৃদয়ে একগোছা টিউলিপ স্টিক কিনে মিসেস হেলবিগের পাশে পাশে চলতে লাগলো।

কিছুদূরে গিয়ে মিসেস হেলবিগ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। দিলীপ দেখতে পেলো একটা ফলকে জর্মান এবং ইংরাজীতে লেখা, 'ইন লাভিং মেমরি অফ আওয়ার ফাদার-গিজলা, এরিকা, উলরিকা।'

দিলীপের আর বুঝতে কিছু বাকি রইলো না। এইখানে ডঃ হেলবিগ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। মিসেস হেলবিগ এবং দিলীপ সমাধির ওপরে টিউলিপ স্টিকগুলো সযত্নে বিছিয়ে দিতে লাগলো। হঠাৎ স্নো-ফল শুরু হয়ে গেলো। মিসেস হেলবিগ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দিলীপ মিসেস হেলবিগের কাঁধে হাত রেখে পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ওই টিউলিপ বাল্বগুলোকে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেরুন রং এর টিউলিপ ফুলগুলো বরফে ঢেকে গেল।

———

টানাপোড়েন

জলপাইগ্নড়ি জেলা হাসপাতালের স্কুল অফ নার্সিং-এর ক্যাপিং সেরিমনিতে হাসপাতালের সব ডাক্তারদের নেমন্তন্ন হয়েছে। হল পরিপূর্ণ। সেই বিখ্যাত সেবা ধর্মের প্রতীক লেডি উইথ দি ল্যাম্প মানে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবন গাথা বর্ণনা দিতে লাগলেন মেট্রন্ শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তা। তারপর একে একে মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বোয়ার যুদ্ধের আহত সৈনিক শিবির-হাসপাতালের সেবাব্রতী দেবী নাইটিংগেলের স্মরণে।

অলকা, হ্যাঁ অলকা ঘোষ আজ এই উৎসবে শপথ গ্রহণ করলো একজন সেবিকা হিসাবে। অলকা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। ইচ্ছে ছিল ডাক্তারী পড়বে, কিন্তু বিধাতা বাধ সাধলেন। গরীব কেরাণী পরিবারে সর্বসাকুল্যে নজন ভাইবোনের বড় বোন অলকা। বাবা রিটায়ার করার দু'বছর আগেই হঠাৎ কেরোনারি এ্যাট্যাকে মারা গেলেন। অলকা হতাশাতে ভেঙে পড়লো। কি করে এই দৈন্য দশা থেকে সংসারকে বাঁচাবে, এই চিন্তা তাকে পাগল করে তুললো।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলো জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতা-লের নার্সিং ট্রেনিং-এ মেয়ে নেবে। ও আর দ্বিধা না করে দরখাস্ত করলো। এবং শেষ কালে একদিন নাম লেখালো কলেজ অফ নার্সিং-এর রেজিষ্টারে।

ঘুম কাতুরে অলকা আজ বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে অসুস্থ রোগীদের পাশে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথা মনে করে ও এগিয়ে চললো নার্সিং শিক্ষার কঠিন পথে ধীরে ধীরে। প্রায়ই ও হোঁচট খেয়ে পড়েছে ক্লান্তিকর এই পথে। কিন্তু ক্ষুধার্ত ভাইবোন ও মায়ের কথা ভেবে মনকে শক্ত করে বেঁধে চলতে লাগলো তার সেবিকা জীবনের পথে।

মাসটা সেপ্টেম্বর। ডাঃ অমলেন্দু সেন প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ হয়ে জল-পাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে বদলি হয়ে এলো। অমলেন্দু কোলকাতা মেডিকেল কলেজের একজন কৃতি ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিভাগের চাকুরি নিয়ে উত্তর

বঙ্গে এই প্রথম পদার্পণ। বেলেঘাটার বিখ্যাত সেন পরিবারের ছেলে। কাজে যোগ দেবার পর জলপাইগুড়ি তার মোটেই ভাল লাগছেনা। জলপাইগুড়ি শহরের এত নাম, কিন্তু শহর হিসাবে ভীষণ ডিপ্রেসিং। এত পুরোনো শহর কিন্তু ভালভাবে কেন ডেভেলপ করেনি অমলেন্দু তা বুঝতে পারে না। সে এখন ভীষণ হোমসিক্। যাইহোক, সে কাজের মধ্যে নিজের মন বসাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কাজ প্রচুর, সহকর্মীরা বললো, 'দেখুন মশাই, মন খারাপ করে লাভ নেই। এখানে আর কিছু থাকুক না থাকুক পয়সা আছে, আর আপনি তা লুটে নিন।'

অমলেন্দুর চেহারার লালিত্য একটু কমে গেল কয়েক দিনের মধ্যে। বাড়িতে মায়ের আদরের ছেলে ছিলো সে। মায়ের স্নেহে বঞ্চিত হয়ে বেশ কয়েকটি মাস কেটে গেল।

অলকার লেবার ওয়ার্ডে ডিউটি। অমলেন্দু খুব খুশী অলকার কাজে। অলকা দেখতে খুব একটা সুন্দর নাহলেও আর পাঁচজনের মধ্যে ওকে চোখে পড়ে। অলকার কাজের মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে। সে জন্যে সে হয়ে উঠলো অমলেন্দুর খুব কাছের মানুষ।

একদিন একটা সিরিয়াস্ এক্লাম্সিয়া রোগী ভর্ত্তি হলো। অলকার সেবা এবং অমলেন্দুর চিকিৎসায় সে ভালো হয়ে উঠলো। রোগিনীটি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলো। সে ছিল জলপাইগুড়ির বিখ্যাত বসু পরিবারের বৌ। ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এলে নীরেন বসু মানে তার স্বামী খুশী হয়ে অমলেন্দু ও অলকাকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। কৃতজ্ঞতার সুত্রে এই বসু পরিবার হয়ে উঠলো এই শহরে অমলেন্দুর উন্নতির পাথেয়। অলকাও কখন যেন এবাড়ির নিজেদের মেয়ের মত হয়ে উঠলো। অলকা অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। তিস্তার ধারে জুবিলি পার্কে সন্ধ্যের অন্ধকারে ওরা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকলো। ওদের নিয়ে হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তারদের মধ্যে একটা কানাঘুসো চলতে লাগলো। অনেকেই ওদের ঠাট্টা করে বলতো, 'কবে নেমন্তন্ন পাবো? আর দেরি কেন?'

এই ভাবে মাস আটেক কেটে গেল। সকলের মনে হলো অমলেন্দু ও অলকার বোধ হয় শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

চপলা ব্যানার্জী নামে একটি মেয়ে কোলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে

স্টাফ নার্স হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে বদলি হয়ে এলো। চপলা সুন্দর দেখতে। খুব লম্বা, সব ডাক্তারদের চোখ পড়লো ওর উপর। কিন্তু অমলেন্দু ছাড়া ওখানকার সব ডাক্তার-ই বিবাহিত। চপলা অপারেশন থিয়েটারে কাজ নিল। কিছুদিনের মধ্যে অমলেন্দুর একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ভীষণ অন্য মনস্ক, গম্ভীর ভাব, নিজের কাজেও যেন তার মন নেই। ঘুমের ওষুধ ছাড়া তার ঘুম হয় না। রাত তখন প্রায় দুটো হবে, ইমারজেন্সি সিজার করবার জন্যে অমলেন্দু অপারেশন থিয়েটারে গেল। অপারেশন শেষে সার্জেন রুমে স্টাফ নার্স চপলা অমলেন্দুকে বললো, 'আমাকে খুব ফাঁকি দিয়ে চাকরি নিয়ে জল-পাইগুড়ি চলে এলে। এতদিন ধরে আমাকে খেলিয়ে এখানে এসে তুমি অলকার সংগে প্রেম করছো, বাঃ চমৎকার! রাইটার্সের সহযোগিতায় এখানে ট্রান্সফার নিয়ে চলে এলাম তোমাকে নিজের করে পাবো বলে।'

অমলেন্দু বলে, 'পুরনোকথা ভুলে যাও। তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চপলা রেগে বললো, 'কেন না, কেন না?'

অমলেন্দু বলে, 'আমার ক্লাশফ্রেন্ড অশোক তোমাকে ভালবাসে, অশোক আমায় বলেছে যে তার সংগে তোমার অনেক দিন আগে থেকে এফেয়ার্স চলছে।'

চপলা প্রতিবাদের সুরে বলে, 'অশোক আমাদের প্রতিবেশী। ছোটো বেলা থেকে ওর সংগে আমার পরিচয়। ও আমাদের বাড়িতে আসতো প্রায়ই। একদিন অশোক আমাকে বিয়ে করবে বলে ওর বাবা মার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলো। কিন্তু ওর বাবা মা একজন নার্সের সংগে ওর বিয়ে দিতে নারাজ। এতে আমি অপমানিত বোধ করি এবং ওর সংগে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিই।'

অমলেন্দু কোন বাক্য ব্যয় না করে সার্জেন রুম থেকে বেরিয়ে নিজের কোয়া-টারে ফিরে গেল।

অল্প দিনের মধ্যে অলকার বুঝতে বাকি থাকল না যে—অমলেন্দুর সংগে চপলার পুরনো একটা সম্বন্ধ ছিলো। বেশ কিছু দিন ধরে অমলেন্দু অলকা এবং চপলার মধ্যে একটা ত্রিপাক্ষিক ঠান্ডা লড়াই চলতে লাগলো সকলের অলক্ষ্যে।

মাস খানেক পরের ঘটনা। কাজের ছেলে কমল একদিন সকালে অমলেন্দুর ঘরে ঢুকে দেখে যে সে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। শত ডাকেও সাড়া দিচ্ছে না। কমল পাশের কোয়ার্টারে ফিজিসিয়ান ডাঃ সন্তোষ রায়কে

ডাকলো। ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি অমলেন্দুর ঘরে এসে দেখে তার বিছানার এক পাশে ঘুমের ওষুধের একটা খালি শিশি পড়ে আছে। ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি অমলেন্দুকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করলো। বারবিচুরেট পয়জনিং যমে মানুষে টানাটানি চললো। পুরো আট চল্লিশ ঘন্টা অজ্ঞান অবস্থায় রইলো অমলেন্দু।

অমলেন্দুর বাড়িতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা-মা চলে এলেন জলপাই-গুড়িতে। পুরো তিন সপ্তাহ পরে অমলেন্দু সুস্থ হলো। কিন্তু মনের ডিপ্রেসন থেকে গেল। কোন কথা বলছে না, খাচ্ছে না। এটা একটা মানসিক রোগ-ডিপ্রেসিক সাইকোসিস্। অমলেন্দুকে পি জি হাসপাতালের মেন্টাল অবজার-ভেশান ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করা হলো।

জলপাইগুড়ি হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো মেয়েরা যত নষ্টের গোড়া। ট্রয় রাজ্যের ধ্বংস হয়েছিলো সুন্দরী হেলেনের জন্য। বলতে দ্বিধা নেই মহীয়সী প্রাতঃ-স্মরণীয়া সীতা দেবীও ছিলেন লংকা কান্ডের জন্য দায়ী।

অমলেন্দুর সহকর্মীরা ওর একটা ডাইরী পেলো। তাতে লেখা ছিলো-'আমি আর টানাপোড়েন সহ্য করতে পারছি না। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই চপলা আমাকে চাপ দিয়েছে তাকে বিয়ে করার জন্য। অপরদিকে অলকা আমার কাছে জানতে চেয়েছে আমি তার জন্য কি ভাবছি। আমি এই দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। আমি আমার জীবনসাথী হিসাবে কাকে গ্রহণ করবো—অলকা না চপলাকে, কিছু ঠিক করতে না পেরে আমি নিজের ইচ্ছাতেই আত্মহননের পথ বেছে নিলাম। এর জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।'

এদিকে হাসপাতালের সেবিকা শিবিরে একটা চাপা গুঞ্জন চলতে লাগলো। কেউ বলছে, চপলা অমলেন্দুকে বিষ খাইয়েছে। কেউ বলছে অলকা খাইয়েছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রন অলকা চপলাকে লম্বা ছুটি দিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকে ওদের দুজনকে আর হাসপাতালের চত্বরে দেখা যাচ্ছে না। হাস-পাতালের কর্তৃপক্ষ অবশ্য সকলের স্বার্থ ভেবেই পুলিশের ঝামেলায় যান নি।

মেন্টাল অবজারভেশন ওয়ার্ডে থেকে মোটামুটি সেরে যাবার পর অমলেন্দুর বাবা ওকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ি ফিরে অমলেন্দু কিছুটা স্বাভাবিক হলেও মাঝেমাঝেই ওর মনের ডিপ্রেশন হতে

লাগলো। কোলকাতার বিখ্যাত মানসিক ব্যাধির সুচিকিৎসক ডাঃ রণজিত পাকড়াসির চিকিৎসায় রইলো অমলেন্দু। ডাঃ পাকড়াসি অমলেন্দুর কেস হিস্ট্রি জেনে বললেন, 'দুটি মেয়ের প্রেমের টানা পোড়েনের জন্য এই সাইকোসিসের উদ্ভব। অমলেন্দুর এই সাইকোসিস যদি অবসেশনে পরিণত হয়, তবে ওর সারার কোন চান্সই নেই। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের অবিবেচক ধ্যান ধারণার জন্যে এই সর্বনেশে পরিণতি'।

অমলেন্দুর বাবা-মা কত আশা করে ছেলেকে পড়ালো ডাক্তারী। আর শেষে একি হলো! একটা সুন্দর জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

হতাশাতে ভেঙে পড়লো অমলেন্দুর সমগ্র পরিবার। ওঁরা সকলে অমলেন্দুর এই অপরিণত চিন্তার শহীদ হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পায়ে মাথা খুড়ে মরতে লাগলেন।

———

মেঘদূত

ভূমধ্যসাগর এখন শান্ত। সমুদ্রটা যেন মনে হচ্ছে একটা কাঁচের পাত দিয়ে ঢাকা। ডলফিনের ঝাঁক জাহাজের আশে পাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এই ডলফিনের উপর ক্যাপ্টেন গ্রের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। সমুদ্র জীবনের প্রারম্ভে এই গ্রে সাহেবকে একজন চাটগাইয়া ক্রু জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

একদিন চট্টগ্রাম তনয় আবদুল মান্নান ইটালির নেপলস্ পোর্টে এক ইতালীয় সুন্দরীকে জাহাজে তুলে ইয়ে করেছিল। ক্যাপ্টেন গ্রের নজর পড়ে যায়। আর যায় কোথায়! প্রথমে ঝগড়া তারপর মারামারি এবং কিছুক্ষণ বাদেই 'হেল্প, হেল্প' বলে আওয়াজ। সমুদ্র তখন খুব অশান্ত ছিল। ইঞ্জিনের আওয়াজ আর সমুদ্রের গর্জনে কেউই গ্রে সাহেবের এই সাহায্য ভিক্ষার কথা শুনতে পেল না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে জাহাজের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার চাউ সাহেবকে খবরটা দিল একজন জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার। চাউ-এর বিশেষ বন্ধু এই গ্রে সাহেব। চাউ সাহেব সংগে সংগে অর্ডার দিলেন লাইফবয় ফেলার জন্যে। চীফ অফিসার তরফদার সাহেব ইতিমধ্যে হইচই করে অনেক লোক জড়ো করে ফেলেছেন। একটা মোটর বোট এবং জাহাজের সিঁড়ি নামান হলো।

গ্রে সাহেবকে অক্ষত অবস্থায় জাহাজে তোলা হলো। তিনি উঠেই বললেন, 'ওয়ান ডলফিন হ্যাজ সেভড মি।'

গ্রে সাহেব যখন জলেতে হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন একটা ডলফিন তাঁর শরীরের তলায় গিয়ে তাঁকে ওর পিঠের ওপর ভাসিয়ে রাখলো। সেই থেকে গ্রে সাহেবের ডলফিনদের প্রতি গভীর টান। এই ঘটনার পর বলাবাহুল্য আবদুল মান্নান খিদিরপুর ডকে নেমেই চাকরী খোয়ালো।

মিঃ গ্রে এবং চাউ সাহেব বিকেলে ডেকের বারান্দা ধরে একটু হাওয়া খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যাস্ত শুরু হলো। মনে হচ্ছে যেন একটা লাল

বড় ফুটবল আকাশ থেকে আস্তে আস্তে নেমে সমুদ্রের জলকে চুমু খাচ্ছে। তারপর হঠাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। এই গ্রে সাহেব একজন দক্ষ নাবিক। কলকাতার সাদার স্ট্রীটের একটা বাড়িতে জন্ম। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের এক-জন কেষ্ট বিষ্টু। ভদ্রলোক একটু সিরিয়াস প্রকৃতির। কাজপাগল লোক। ফাঁকি দেওয়া বা ওটাকে সহ্য করার মানসিকতা ওঁর নেই।

এই এম ভি মেঘদূতেই ওঁর কাজের শুরু একজন ক্যাডেট হিসেবে ষোলবছর বয়সে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে ধাপে ধাপে তিনি ক্যাপটেন হয়েছেন।

এই মেঘদূত জাহাজকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। কত ভাল ভাল সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু মেঘদূত ছেড়ে তিনি কোনদিন অন্য কোন জাহাজে গেলেন না। দশ হাজার টনের এই জাহাজে বাহান্ন জন নাবিক নিয়ে তিনি সারা জীবন ভুলে রইলেন।

আরে জেনোয়া বন্দর দেখা যাচ্ছে যে! ফ্রন্ট ডেকে ইটালির ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেওয়া হলো। জেনোয়াতে লোডিং আনলোডিং-এর জন্যে প্রায় পনেরো দিন থাকতে হবে। এখানে স্পেগেটি, ম্যাকারণি আর ফিয়েট গাড়ী উঠতে লাগলো জাহাজে। এই সব জিনিষ যাবে কুয়েতে। পোর্টের রেস্তোরাগুলোতে ঝিনুক আর শামুক সেদ্ধ খাওয়া দেখে চাউ সাহেব তো অবাক। ইটালিয়ানরা এক একটা ঝিনুকের মুখটা খুলছে আর চামচে করে মাংসটা মুখে পুরে দিচ্ছে।

পনেরদিন পরে জাহাজ রওনা হলো কুয়েতের দিকে। কুয়েতের কাছ বরাবর আরব সাগর ভীষণ অশান্ত। জাহাজের ভীষণ রোলিং হচ্ছে। বাটা-মাছের মত দেখতে আড়াই-তিনশো ওজনের ফ্লাইংফিসগুলো ডেকের ওপর উড়ে এসে পড়ছে। বেশ কিছু ফ্লাইং ফিস কুড়িয়ে ফ্রিজে রাখা হলো। ওই মাছের ফ্রাই এবং কারি বেশ কয়েকদিন ধরে খাওয়া হলো। খেতে বেশ ভালই লাগলো।

এই মেঘদূত কত রকমের সামগ্রী যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেঁছে দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার সুদান থেকে চারশো ষাঁড় উঠলো। এগুলোকে পেঁাছে দিতে হবে সুয়েজ বন্দরে। দেড়দিনের পথ। ডেকের উপর ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে রইলো ষাঁড়গুলো। তাদের কোন খাবার বা জলের কোন বন্দোবস্ত করা গেল না। ওরা খিদেতে তেষ্টাতে হাম্বা হাম্বা করে খালি চেঁচাতে লাগলো। জাহাজের সকলের দু'রাত কোন ঘুম নেই। গোটা দশেক ষাঁড় ডেকের ওপরই মারা গেল।

বেশ কিছুদিন আগে আমাদের দেশ আমেরিকা থেকে গম কিনতো। এর জন্যে কত সমালোচনা। কিন্তু অনেকে জানে না পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিকাশশীল দেশ আমেরিকার থেকে গম কেনে।

একবার আমেরিকার মিসিসিপি নদীর ধারে অবস্থিত বাটন রুজ বন্দর থেকে গম বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হলো হল্যান্ডের রটারডাম বন্দরে।

যে যাই বলুক রাশিয়ার সংগে ভারতের চুক্তিতে আমাদের কত জিনিষ যে রাশিয়ানরা ব্যবহার করছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

ব্ল্যাকসীর ধারে রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে একবার এই মেঘদূত বয়ে নিয়ে এসেছিল চা, কলগেট টুথপেস্ট, সার্ফ, আরও কত কি। চাউ সাহেব তো গ্রে সাহেবকে ঠাট্টা করে বলে ফেললো, 'জানেন ক্যাপ্টেন গ্রে, আমাদের শিবপুরে শান্তির মোচার চপ খুব বিখ্যাত। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট একটু পুশ করলে রাশিয়ানরা ঐ চপ খেয়ে খুবই আনন্দ পাবে।'

চীফ ইঞ্জিনীয়ার ঐ চাউ সাহেব ওরফে ডি. কে. চৌধুরী খুবই রসিক লোক। খুব সং। একবার যুগোশ্লোভিয়ার ভয়েজে একটু বেড়াতে বেরিয়ে উনি জাহাজে খুব সস্তায় এককিলো ভাল আঙুর কিনে নিয়ে এলেন। জাহাজে ফিরলে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়াররা চাউ সাহেবকে বললো, 'স্যার অপনি আঙুর কিনে নিয়ে এলেন। আমরাতো গতকাল বেড়াতে গিয়ে আঙুর ক্ষেত থেকে কিলো দুই আঙুর ঝেড়ে নিয়ে এসেছি।'

চাউ সাহেব হেসে উত্তর দিলেন, 'তোমাদের ইন্ডিয়ান স্বভাব আর গেল না। এই ভাবে ধরা পড়লে কিন্তু কোম্পানি তোমাদের কোন সাহায্য করবে না।'

মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এই চাউ সাহেব ১৯৫৪ সালের ফার্স্ট ব্যাচের ছেলে। ঐ বছরই তারাতলা রোডে মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ শুরু হয়েছে। হোস্টেল থেকে পাশের বৃটানীয়া কোম্পানির বিস্কুটের গন্ধে অর্ধেক পেট ভরে যেতো।

চাউ সাহেব প্রথম চাকরীতে যোগ দিয়ে এই মেঘদূতের ইঞ্জিন রুমের সিঁড়িতে কতবার যে বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছেন তার ঠিক নেই। চাউ সাহেবের ঐ সময় মনে হয়েছিলো মেরিণ ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে যদি সী সিকনেস কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তবে তো লাইন চেঞ্জ করতে হবে। এই গ্রে সাহেবই তখন বলেছিলেন, 'চাউ, সী সিকনেস ইজ নো সিকনেস। ইউ ভমিট এন্ড ওয়াৰ্ক।'

হাওড়া শিবপুরের চন্দ্র সাহেবের বাগানের ইসলাম তখন এই মেমদুতের খালাসী। একজন চেনা পাড়ার ছেলে পেয়ে চাউ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা সী সিকনেসে কি করিস।'

ইসলাম বললো, 'থোড়া সমুন্দরকা নিমক পানি পি লিজিয়ে। সব ঠিক হো যায়গা।'

এই গ্রে সাহেব সহানুভূতির সংগে একটা এ্যাভোমিন ট্যাবলেট আর এক গ্লাস জল নিয়ে চাউ নাহেবের কেবিনে ঢুকে বললেন, 'চাউ, টেক দিস ট্যাবলেট।' ঐ ট্যাবলেট কতখানি কাজ করেছিলো জানা নেই, তবে গ্রে সাহেবের সহানুভূতির পরশই বোধ হয় চাউ সাহেবের সী সিকনেস্ সারিয়ে দিলো। চাউ সাহেব আর গ্রে সাহেবের ঘনিষ্ঠতা সেই থেকে শুরু।

একবার চাউ সাহেবের জাহাজের বিশাল ফ্রিজে করে এক বিলিতী কোম্পানির ওষুধ নিয়ে আসা হচ্ছিল কোলকাতায়। ওষুধের ইনভয়েসে লেখাছিল ওগুলো যেন কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে রাখা হয়। সারা রাস্তায় দশদিন ধরে চাউ সাহেবের ঘুম ধরছে না। অনেক রাতে উঠে ফ্রিজের টেম্পারেচার মাপেন। ও'র একমাত্র চেষ্টা যাতে ফ্রিজ ঠিক কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পাচার মেনটেন করে।

এত কষ্ট করে ওই ওষুধ আনা হলেও খিদিরপুরে এসে জাহাজ থেকে ঐ ওষুধগুলো ক্রেনে করে নামিয়ে একটা গরম টিনের শেডে দশ দিন রাখা ছিলো। চাউ সাহেবের এটা খুব পীড়াদায়ক হয়েছিলো।

একবার জাহাজ মিডসীতে চলেছে। হঠাৎ দেখা গেল সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিবর্তন করার যন্ত্র মানে ইভাপোরেটারটা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ কিং জর্জ ডক থেকে কোলকাতা করপোরেশনের যে খাবার জল তোলা হয়েছিলো তাও শেষ। এই চাউ সাহেব তিন ঘন্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঐ যন্ত্রটা সারিয়ে ফেললেন। গ্রে সাহেব কি খুশী। চাউকে জড়িয়ে ধরে নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে আইসক্রীম দিয়ে এক পেগ হুইস্কি অফার করলেন এবং চাউ সাহেবের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'ইউ আর গ্রেট।'

ক্যাপ্টেন গ্রে খুব ফিটফাট লোক। ওনার ডিউটি ড্রেসটি একেবারে স্পটলেশ। সাদা হাফ প্যান্ট, হাফহাতা সাদা সার্ট, ঝক্ঝকে টুপি, কালো সু এবং সাদা মোজা পরা গ্রে সাহেবকে দারুণ দেখাতো। একবার লিভারপুলে এক কাস্টমস্ অফিসার বলেছিলো, 'মিঃ গ্রে, ইউ আর লুকিং লাইক ক্যাপ্টেন অফ টাইটানিক।'

গ্রে সাহেবের সব দিকে নজর। খালাসী থেকে চীফ অফিসার পর্যন্ত সকলের খাওয়া দাওয়া কি রকম হচ্ছে, কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা সর্বক্ষণ তার খবরদারী করে চলেছেন।

বছর পাঁচেক আগে রেডিও অফিসার এ্যান্টণি যোশেফ হার্ট এ্যাটাকে জাহাজেই মারা গেলেন, মৃত দেহটাকে ফ্রিজে রেখে তার পরিজনদের ত্রিবান্দ্রমে খবর পাঠানো হলো। টানা দশ দিন বাদে মাদ্রাজ পোর্টে বডি নামিয়ে লরী করে নিয়ে যাওয়া হলো ত্রিবান্দ্রমে যোশেফ সাহেবের বাড়িতে। এই গ্রে সাহেব নিজে শবযাত্রা থেকে আরম্ভ করে মায় বেরিয়াল পর্যন্ত সেরে তবে মাদ্রাজ পোর্টে ফিরলেন। গ্রে সাহেবের হাই রেকমেন্ডশনে মিঃ যোশেফের স্ত্রী কোম্পানির মাদ্রাজ অফিসে করণিকের কাজ পেলো।

মেঘদূত জাহাজের বেশ বয়স হয়েছে। চারদিকে নানান অবক্ষয়ের চিহ্ন। কিন্তু মেঘদূতকে গ্রে সাহেব মা বলতেন। তাঁর ক্ষমতায় যা আছে তা দিয়ে মায়ের পরিচর্যা করতেন। কোন জায়গায় যদি ময়লা দেখেন নিজেই হাতে করে তা পরিষ্কার করেন।

গ্রে সাহেব প্রায়ই চাউ সাহেবকে বলতেন, 'চাউ, আই লাভ হার লাইক মাই মাদার। হোয়াট আই এম টোডে, ইট ইজ ডিউ টু হার লাভ টু মি।'

সেকেন্ড অফিসার রাজেশ শ্রীবাস্তব দেশ থেকে ফিরে মাদ্রাজ পোর্টে কাজে যোগ দিল। সংগে এনেছে এক টুকরি লাংড়া আম। চাউ সাহেব সকলকে ডেকে আমবিলি করলো।

গ্রে সাহেবকেও ছাড়লো না। গ্রে সাহেব খুব খুশী। আম খেতে খেতে চাউ সাহেব বলতে লাগলো, 'গ্রে সাহেব, মোম্বাসাতে আফ্রিকান আম খেয়েছি, থাইল্যান্ডের আমও খেয়েছি। হুস্টোনে গিয়ে মেক্সিকান আম খেয়েছি। সব জায়গার আম মিষ্টি ঠিকই কিন্তু আমাদের দেশর ল্যাংড়া আমের মত স্বাদ আর গন্ধ ঐ সব আমের নেই।'

এবারে মেঘদূত মাদ্রাজ থেকে রওনা হলো অস্ট্রেলিয়ার টাউনস্ভ্যালী পোর্ট অভিমুখে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে প্রবালের খুব ভয়। জলের তলায় উঁচু গাছের-মত বড় বড় প্রবালের শাখাপ্রশাখা ইস্পাতের ফলার চেয়েও ধারাল হয়। জাহাজকে মেরিন চার্ট দেখে সেফ্টিজোন দিয়ে এগুতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই জাহাজের সাইডপ্লেট ফাঁসিয়ে দেবে। টাউনসভ্যালী পোর্ট আর মাত্র দশ নটিক্যাল

মাইল দূরে। নেভিগেশন ডেক থেকে ইঞ্জিনরুমে নির্দেশ এলো, "ডেড স্টপ"।

স্টীয়ারীং হুইলে বসে আছেন ক্যাপ্টেন গ্রে। মনে হচ্ছে উনি বড় চিন্তিত।

চাউসাহেব ইঞ্জিনরুম থেকে গ্রে সাহেবকে ফোন করলেন, 'হোয়াট্স রং ক্যাপ্টেন গ্রে?'

গম্ভীর গলায় গ্রে সাহেব বলে উঠলেন, ইংরিজিতে যার মর্মার্থ হলো, 'আমাদের জাহাজ প্রবালের জংগলের মধ্যে এসে পড়েছে। আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট সেকেন্ড মেট মেরিন চার্ট, মানে যা দেখে জাহাজ চালাতে হয় তা পড়তে ভুল করেছে। জাহাজ বিপথে এসে পড়েছে।'

কিছুক্ষণ বাদে জাহাজ কিসে যেন ধাক্কা খেল। মেঘদূত ভীষণভাবে নড়ে উঠলো। মিনিট পাঁচেক বাদে জাহাজে জল ঢুকতে শুরু করলো।

পাম্প চালু করে দিলেন চাউ সাহেব। ঠিক ধরা যাচ্ছে না লিকটা কোথায় হয়েছে। আচমকা একেবারে আর্টিজিও কূপের মত জল ইঞ্জিনরুমে ঢুকতে লাগলো। চাউ সাহেব ইঞ্জিনরুমের সকলকে উপরে উঠে আসতে বললেন। কিছুক্ষণ বাদে জল ঢুকে ইঞ্জিন ও পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত জাহাজে লোড-শেডিং হয়ে গেলো।

ঘটনাটা ঘটেছে বেলা তখন প্রায় দুটো হবে। রেডিও অফিসার এস-ও-এস খবর পাঠাবার হুকুম পেলেন ক্যাপ্টেন গ্রের কাছ থেকে। রেডিও অফিসার মজুমদার সাহেব পাংশুমুখে অথচ ধীর মস্তিষ্কে খবর পাঠাতে লাগলেন, 'মেসেজ ফ্রম মেঘদূত অফ ইন্ডিয়ান সিপিং কম্পানি। সী ইজ সিংকিং এ্যাট টুয়েন্টি ডিগ্রি সাউথ এ্যান্ড হান্ড্রেড ফর্‌টি সেভেন ডিগ্রি ইস্ট। হেল্প প্লিজ।'

জাহাজের সকলকে আপার ডেকে জড়ো করে রোল কল করা হলো। লাইফ-বোটগুলো জলে নামানো হলো। প্রত্যেককে একখানা করে লাইফ জাকেট দেওয়া হলো।

গ্রে সাহেব সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'ডোন্ট ওয়ারি। ইট ইজ এ স্ট্রেট সিংক, নো ক্যাপসাইজ। গড উইল হেল্প ইউ।'

খালাসী সেলিম মোল্লা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, 'বাবু হামারা বিবি বাল বাচ্চাকো কেয়া হোগা।'

চাউ সহেব ওকে আশ্বস্ত করলেন—'কিছু ভয় নেই, উঠে যাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারছে—সমুদ্রের জল ডেক থেকে প্রায়

হাতের নাগালে।

একমাত্র গ্রে সাহেব ছাড়া একে একে সকলে লাইফ বোটে উঠে গেল।

চাউ সাহেব চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, 'ক্যাপ্টেন গ্রে স্টিল দেয়ার ইজ টাইম, কাম ওন দি বোট। হ্যারি আপ।'

নিঃসন্তান, বিপত্নীক গ্রে সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'গো অ্যাওয়ে কুইকলি ফ্রম হীয়ার টু এ্যাভয়েড দি হুরইল। গো অ্যাওয়ে সুন।'

হাইস্পীডে লাইফবোটগুলো ছুটতে লাগলো।

গ্রে সাহেব সমনের ডেকের ফ্ল্যাগমাস্টারকে দৃঢ়ভাবে এক হাতে ধরে অন্য হাত কপালে ঠেকিয়ে ও‍ঁর পরম আরাধ্য মাকে শেষ প্রণাম জানালেন। লাইফবোট-গুলো জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে গেছে। সকলে দেখতে পাচ্ছে গ্রে সাহেব নিশ্চল অবস্থায় স্যালুটিং পজিশনে দাঁড়িয়ে আছেন। জল ডেকের উপরে উঠে গেছে। ফ্ল্যাগ-মাস্টটা আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাচ্ছে। গ্রে সাহেবের কোমরের কাছে জল। ও—না, গ্রে সাহেবকে আর দেখা দেবা যাচ্ছে না। চাউ সাহেব বায়নাকুলারটা দিয়ে দেখতে পেলেন গ্রে সাহেবের টুপিটা জলে ভাসছে।

মুসলমান খালাসীরা ওদের হাতগুলো বুকের কাছে তুলে বলে যাচেছ, 'আল্লা সালাল্লা, গ্রে সাহেব-কো মেহেরবাণী কিজিয়ে।'

চাউসাহেব হাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন, 'বিদায় বন্ধু বিদায়।'

মেঘদূত যেখানে নিমজ্জিত সেখানে আর জলের ঘূর্ণি নেই। গ্রে সাহেব পুরোনো জাহাজী ঐতিহ্য বজায় রাখলেন; জাহাজ যখন সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে যায় তখন তার ক্যাপ্টেনও ঐ জাহাজের সঙ্গে সলিল সমাধি বরণ করে।

—

যবনিকা

'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্'—শ্লোকটা কানাইবাবু মানে শ্রীকানাই লাল চক্রবর্ত্তী আমাকে বললেন। কানাইবাবু আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বিজ্ঞব্যক্তি, বয়েস তিরাশি। চায়ে আবার একবার চুমুক দিয়ে শুরু করলেন, 'দাতাকর্ণ অর্জুনের চেয়েও অনেক বেটার স্টাফ, কি যুদ্ধ বিদ্যায়, কি পৌরুষত্বে। কিন্তু তিনি জীবনে একেবারে আনসাকসেসফুল! ওঁরতো সবই ছিল কিন্তু তা সত্বেও ওকে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে জীবন দান করতে হলো, রাজদণ্ড হাতে নিয়ে রাজত্বও করতে পারলেন না। কপালে যা লেখাছিল তাই হলো।' বাকি চা টুকু চুমুকে শেষ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভায়া কিছু বুঝলে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ডেসটি'নিকে কেউ রুখতে পারবেনা; আর সেটাকে মেনে নিতে পারলেই চরম শান্তি, আর না পারলেই তুমি হয়ে গেলে।'

কানাইবাবু বলে উঠলেন, 'সাবাস্ তুমি সার বুঝেছ।'

সত্যভামার মৃত্যুতে আমার বিশবছর বিবাহিত জীবনে যে ছেদ পড়ল তাতে আমার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বহু চিঠি আসতে লাগলো আমার কাছে। কেউ লিখেছে, 'ভগবান মঙ্গলময় এবং তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যে—এই ভেবে আপনি নিজেকে শক্ত করুন।' আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু লিখেছে—'নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্ আর অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ পড়, ভুলতে পারবি।' আমার স্ত্রীর আত্মার শান্তি কামনা করে বহু লোকই আমাকে সমবেদনা জানিয়েছেন। আমার পাড়ার এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন—'সবই শুনেছি। তবে আপনি জোর বেঁচে গেছেন, আপনার ছেলেপুলে থাকলে আপনি কি বিপদে না পড়তেন!' এ কথাতে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। আমি প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলাম, 'এ আপনি কি বলছেন, আমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, আমি ভালই রোজগার করি। আমার পঞ্চাশোর্ধ বয়েস হয়েছে। সন্তান সন্ততি থাকলে আমি তাদের অবলম্বন করে বাঁচতে পারতাম, জীবনে একটা পারপাস থাকতো।'

ভদ্রলোক আর একটি কথাও বললেন না। 'হ্যাঁ তা তো ঠিক, তা তো ঠিক'

বলে বিদায় নিলেন।

বাবামা দেখেশুনে বিশ বছর আগে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু বিয়ের আগে মেয়ে দেখিনি। আমি যখন লাভ ম্যারেজ করছিনা তখন বাবা-মার পছন্দ মেনে নেবো—এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিলো। আমার বিয়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাবার হাতে ছেড়ে দেওয়াতে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন।

মা অবশ্য একটু চিন্তিত ছিলেন। মা আমাকে বললেন, 'তুই একবার দেখে আয় না। আমাদের তো মেয়ে ভালই লাগলো।'

আমি বললাম, 'তোমরা যা দেখে দেবে. আমি খুশী মনে তা গ্রহণ করবো।'

খুব ধুম ধাম করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই বললো, 'বৌমা খুব সুন্দর হয়েছে, গুণবতী লক্ষ্মীমন্ত' ইত্যাদি।

আমার অফিসের সহকর্মীরা বললো, 'আপনি একটা খেলা দেখালেন। বিয়ের আগে মেয়ে না দেখে, এমনকি একটা ছবি পর্যন্ত না দেখে বিয়েতে রাজি হওয়া, এই বিংশশতাব্দীতে ভাবাই যায় না।'

সব মানুষই ভালবাসার কাঙাল। বিয়ের পর আমার স্ত্রী মানে সত্যভামা চেয়েছিলো শ্বশুর বাড়ির সবাই-এর ভালবাসা। বাবার বাইরেটা বড় কঠিন ছিল, মা ছিলেন ভাবলেশশূন্য, এজন্য বাবা-মার ভালবাসার পরিমাণটা মাপা শক্ত। তবে আমার দিদিমা সত্যভামাকে দিয়েছিলেন অকৃপণ ও আন্তরিক ভালবাসা। আমি নিজে অবশ্য ভালবাসা কথাটার মানে বুঝতাম না। যা বুঝতাম তা হচ্ছে 'এ্যাডযাস্টমেন্ট এন্ড আন্ডারষ্টানডিং উইথ ইচ আদার।'

আমাদের প্রতিবেশীরা কিন্তু ওকে দারুণ পছন্দ করতেন। তার কারণ ও নিজেকে বাড়ির চার দেওয়ালের ভেতর আটকে রাখতো নিজের থেকেই। কেউ কিন্তু ওকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেনি। বিনা নিমন্ত্রণে ও কারও বাড়িতে যেতো না। কেউ ওকে তাদের বাড়িতে এমনি বেড়াতে যেতে বললে ভদ্রতা বাঁচিয়ে ও কিন্তু এড়িয়ে যেত। মন্দা কথা ও চলনে বলনে একটু রিজার্ভড ছিলো। পাড়ার বুড়ী শাশুড়ীরা তাদের বৌয়েদের বলতে শুনেছি, 'দেখে এসো ওদের বৌমা কি সুন্দর দেখতে, কি সুন্দর ব্যবহার, কথায় কথায় ঢাং ঢাং করে যেখানে সেখানে যায়না।'

হঠাৎ দরজায় করা নাড়ার শব্দ, দরজা খুলে দেখি কানাইবাবু এসেছেন। কানাইবাবুর জন্যে চা আনতে বললাম। কানাইবাবু বললেন—'আচ্ছা ভায়া

তুমি বৌমাকে স্বপ্ন টপ্ন দেখছো ?' আমি উত্তর দিলাম, 'আজ তিনমাস হলো ও চলে গেছে কিন্তু একদিনের জন্যেও ওকে আমি স্বপ্নে দেখিনি।' কানাইবাবু তো অবাক। আমি মনে মনে ভাবি—বোধ হয় ও খুব গুড সোল এবং ওর এই জীবনের সব কর্ম শেষহয়ে গেছে আর সেই জন্যই এই মর্ত্যের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ও জড়িয়ে নেই। ওর আত্মা বোধহয় সত্যিই পরলোকে শান্তিতে বিরাজমান।

চা খেতে খেতে কানাইবাবু আবার শুরু করলেন, 'দেখো ভায়া নিজেকে শক্ত করো। জানতো রবীন্দ্রনাথেরও খুব অল্প বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু তিনি গৌরবের চরমে উঠেছিলেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই। পন্ডিত নেহেরু তাঁর পত্নীর তিরোধানের পরই কিন্তু দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তর কালে এক বিরাট পুরুষ হয়েছিলেন।'

আমি বললাম, 'দেখুন কানাইবাবু, আমি তো এঁদের মত অত বড় লোক নই। আমি সামান্য মানুষ। আর একটা কথা রবীন্দ্রনাথকে মৃণালিনী দেবী এবং পন্ডিত জহরলাল নেহেরুকে কমলা দেবী স্বর্গ থেকে অনুপ্রেরণা দিতেন।'

কানাই বাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমাকেও তোমার স্ত্রী সত্যভামা দেবী সত্যলোক থেকে জোগাবে উৎসাহ আর প্রেরণা। তুমি যে কাজের কাজী তা মন দিয়ে করে যাও। শান্তি পাবে।'

সকাল থেকেই সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ। ও চলে যাবার পর ওর অবর্তমানে আজ আমাদের বিবাহের দিন উপস্থিত। ১৩ অগাষ্ট, ২৭শে শ্রাবণ তারিখটা আমাদের ঘরের ক্যালেন্ডারে ঝক্ ঝক্ করে চোখে পড়ছে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। চলে গেলাম অধ্যাপক বিমল বাবুর বাড়ি। ওর সংগে চাকুরী জীবনে দার্জিলিং-এ আলাপ হয়েছিল। আমার এই দুঃখ-সংবাদ উনি আগেই পেয়েছিলেন। আমি যেতেই উনি এবং ওর স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে বসালেন এবং আমাকে ঘিরে সস্ত্রীক বসে পড়লেন। বিমল বাবু বললেন, 'দেখুন ডাঃ হাটুয়া, আপনি ভেঙে পড়বেন না। আপনার স্ত্রী আপনার সংগেই আছেন। উনি আপনাকে ছেড়ে চলে যান নি। আপনি নিশ্চয়ই স্যার অলিভার লজের নাম শুনেছেন। স্যার অলিভার লজ ফোটগ্রাফির সাহায্যে প্রমান করে দিয়েছেন যে মৃত্যুর পরে মৃতের একেবারে স্বর্গলাভ হয় না। সে তার খুব প্রিয়জনের পাশে পাশেই থাকেন। জাগতিক অবয়ব সবই বর্তমান থাকে, তবে মৃতের ছবিটা একটু আবছা হয়। আউট অফ ফোকাস

ছবির যা হয় তাই। একে বলে সূক্ষ্ম দেহ বা সাট্‌ল্‌ বডি।'

ইতিমধ্যে মিসেস চ্যাটার্জী আমাদের জন্য চা, জলখাবার নিয়ে এসেছেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বিমলবাবু আবার শুরু করলেন, 'ডাঃ হাটুয়া আপনি হয়তো জানেন যে আত্মা তিনটি স্তরে বিচরণ করে। স্তরগুলি হচ্ছে ভূলোক, ভুবর লোক ও স্বর্লোক। ইহ জগতে কারো মৃত্যু হলে তাঁর আত্মা ইহ জগতের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য কিছুদিন তার প্রিয়জনের কাছাকাছি থাকার আশায় ঐ মধ্যম স্তর মানে ভুবর লোকে বিরাজ করে।' বিমলবাবু একটু থামলেন এবং নিজের চা জলখাবার সম্ব্যবহার করে আবার শুরু করলেন, 'কুরু-পান্ডবের যুদ্ধে যখন অর্জুন কিছুতেই তাঁর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে দেখ অর্জুন, জন্মের পরে মৃত্যু যেমন অবধারিত তেমনি মৃত্যুর পরে জন্মও অবধারিত। আত্মা অবিনশ্বর এবং তা পুনর্জন্মের মধ্যদিয়ে সব সময়ই বিদ্যমান। অতএব তুমি অস্ত্রধারণ করে কুরুদের বিনাশ সাধন করো।'

ইতিমধ্যে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার আগে বিমলবাবু আমাকে বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের 'দেবযান' বইটি পড়বার উপদেশ দিলেন।

সব মেয়েরই বিয়ের পর একান্ত নিজের করে ঘর বাঁধার ইচ্ছে হয়। এটা অবশ্য কোনো অন্যায় নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এই জিনিষটা আত্মকেন্দ্রিক মনে হবে। তাহলেও নিজের স্বামী, নিজের ছেলে মেয়ে নিয়ে একটা সুখের নীড় তৈরী করতে কোন্‌ মেয়ে না আশা করে।

বিয়ের পর বারো বছর একান্নবর্তী পরিবারে থাকার পর আমি দার্জিলিং-এ বদলি হলাম। আমার স্ত্রী অসীম উৎসাহে নিজের ঘর সাজালো এবং নিজের সংসারকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুললো পরিপূর্ণতায়। আমার পরিচিত জনেরাতো বৌদি বলতে অজ্ঞান। দার্জিলিং-এর প্রতিবেশীদের হৃদয়ে আমার স্ত্রী একটা ভালবাসার আসর জমিয়েছিল। কলকাতায় আবার বদলি হয়ে ওর সেই সুখের সংসার ভেঙে গিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু ওর সহনশীলতা এবং আন্তরিকতায় নিজেকে আবার আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে এ্যাডযাস্ট করার চেষ্টা করছিলো।

দার্জিলিং-এ আমি সময় কাটাবার জন্য আমার সহকর্মীদের নিয়ে নাটক

করতে শুরু করলাম। ও আমাকে এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দিতো। তবে ও ছিলো আমার কঠিন সমালোচক এবং সেই জনাই বোধ হয় আমি নাটক ভালই করতাম। লোকে তো তাই বলতো। নানাভাবে ঐ প্রবাস জীবন আমাদের দুজনের খুব ভালই কাটতো। কলকাতায় ফিরে আমরা দুজনে ঐ প্রবাস জীবনের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে খুবই আনন্দ পেতাম। বছরে একবার করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মেডিক্যাল কনফারেন্সে যোগ দেবার সুবাদে বেশ ভালই বেড়ানো হতো। এইভাবে মোটামুটি কেটে যাচ্ছিলো দিনগুলো। কিন্তু একি হলো, ভগবান ওকে আমার কাছ থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিলো। জানিনা গত জন্মে আমি কি পাপ করেছিলাম যাতে আমাকে আমার নিঃসন্তান জীবনের একমাত্র সঙ্গীকে হারাতে হলো।

আজ আমার এক উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের শুরু। কিন্তু আমার মনে হয় জীবনের একটা উদ্দেশ্য না থাকলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার তো বারে বারেই মনে হয় আর বেশী কাজ করে কী হবে। একজনের জন্য আর কত টাকার প্রয়োজন। জীবনের একটা উদ্দেশ্য তৈরী করার জন্যেই সমাজে বিবাহ, সন্তান-সন্ততি, এসবের প্রয়োজন। সংসারে দায়দায়িত্ব থাকলে মানুষ কাজ করবে এবং সমাজ পাবে সেই মানুষের কাছে সারভিস্। কিন্তু আমার মত মুক্ত পুরুষের সংসারে কাজের স্পৃহা কমে যায়। তাতে করে সমাজ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই মনে হয় সংসারে জ্বালা আছে ঠিকই কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য রচিত করে সংসারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব।

আমার বিয়ের দিনটা আজও ভাল করে মনে পড়ে। পুরুত ঠাকুরের সেই মন্ত্র 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।' এই হৃদয়ের মিলন একদিন যে শুভ লগ্নে ঘটেছিলো সেটা এক অশুভ লগ্নে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। এটা কি করে সহ্য করা যায়।

আমাদের ছেলেদের এক মহাবিপদ, আমরা ভাল করে কাঁদতে পারিনা। সব দুঃখ মনের গহ্বরে গুমরাতে থাকে, এতে যে বড় কষ্ট। সেই জন্যেই সেই বিখ্যাত কবি লিখেছিলেন—'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড্......সী মাস্ট উইপ অর সী উইল ডাই।'

সাত পাকের সেই বন্ধন কেন একদিন এইভাবে ভেঙ্গে যায় জানিনা। সবই বোধ হয় ভাগ্য—'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।'